অবভাস-বিজ্ঞান ও অস্তিত্ববাদ

অবভাস-বিজ্ঞান
ও
অস্তিত্ববাদ

সুনীল কুমার সরকার

পি-এইচ.ডি (ইংরেজী ও দর্শন)।

রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ।

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

অ্যাকাডেমিক এন্টারপ্রাইজ

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্টোবর, ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ
ইন্দু চক্রবর্ত্তী
২৪৯/এ, পূর্ব কোদালিয়া
নবব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

কম্পোজ
লেসাব পয়েন্ট
২৯/১এন, হরে কৃষ্ণ শেঠ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৫০

মুদ্রকঃ
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণী
কলকাতা- ৬

ঃ উৎসর্গ ঃ

স্নেহের

বাবাই ও ছোটনকে

সূচীপত্র :

মুখবন্ধ

দর্শনের নিরবচ্ছিন্ন ধারা থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসেছে বহুবিধ উপধারা যা দর্শনকে করেছে সমৃদ্ধ, মানুষের চিন্তার জগতকে করেছে প্রসারিত। ইয়োরপীয় দর্শনের ধারা থেকে এমনিভাবে ১৯১৩ সালে উপজাত হয় এক অভিনব শাখা যা গতানুগতিক দার্শনিক চিন্তার ভিত বলতে গেলে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই নতুন দর্শন-শাখাই হলো অবভাস-বিজ্ঞান (Phenomenology)। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ফরাসী গণিতবিদ রেঁনে দেকার্ত দর্শনকে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাঝ পথে গিয়ে তিনি নিজেই সেই কুসংস্কারের হাত ছানিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এর প্রায় তিনশ' বছর পর জার্মান গণিতবিদ আলবার্ট এড্‌মুণ্ড গুস্টাফ হুর্সেল দেকার্তের অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে দার্শনিক চিন্তাধারাকে আমূল পাল্টে দিলেন। তিনিও দর্শনকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে চাইলেন। তিনি বললেন, যে অবধি দর্শন বিজ্ঞানের মতো অনমনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যকে অনুসন্ধান করতে না পারবে, সে পর্যন্ত দর্শন কেবল আঁধারে পথ খুঁজতে থাকবে।

হুসের্ল অবধি দার্শনিকগণ দর্শনের আলোচ্য বিষয়-বস্তুটিই নির্দ্দিষ্ট করতে পারেননি। জগতে দুটো মূল বিষয় রয়েছে—একটি হচ্ছে অবভাস (phenom enon) অর্থাৎ যা আমরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পাচ্ছি, আর একটি হচ্ছে এই অবভাসের অন্তরালে অবস্থিত অপ্রত্যক্ষ-গোচর পরমসত্তা (nounmenon)। কোন কোন দার্শনিক বলেছিলেন, অবভাসই হবে দর্শনের আলোচ্য বিষয়। অপর গোষ্ঠী বাদ সাধলো। তাঁরা বললেন, দর্শনের আলোচ্য বিষয় হবে পরমসত্তা। হুসের্ল বললেন, কোনটিই নয়। তিনি বললেন, দর্শনের বিষয় হবে চেতনায় অবস্থিত "বস্তু" বা "বিষয়ের" (being in consciousness) অনুসন্ধান। তাঁর প্রশ্ন হলো : কী করে আমাদের চেতনায় বহুর্বিধ বস্তুর ধারনা (concept or essence) জন্মায়? হুসের্লের মতে এই ধারনা অভিজ্ঞতা পূর্বভাবে (a priori) চেতনায় গঠিত হয়। বস্তুর ধারনা আর বস্তুর অর্থ (meaning) প্রকৃপক্ষে অভিন্ন। কাজেই হুসের্ল তাঁর প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে আবার এভাবেও উপস্থিত করেছেন : বস্তুর অর্থ-গঠন আমরা কেমন করে করি? একটি বই-এর ধারনা অথবা অর্থ আমার চেতনায় রয়েছে। হুসের্লের প্রশ্ন : এই ধারনাটি অথবা এই বিশেষ বস্তুটির অর্থটি আমার চেতনায় কেমন করে গঠিত হলো?

প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে হুসের্ল যে বিষয়টির অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, ইত্যাদি করেছেন তা কোন বস্তুময় বিষয় নয়—তা হলো বিশুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত "বস্তুর উপস্থিতি"। তিনি বারংবার বলেছেন, এই প্রকৃত বিষয় বা বস্তুতে ফিরে যাও (*su den Sachen*)। এই বিষয়টিকেই হুসের্ল অবভাস বলেছেন। এ-অবভাস হলো মনোগত (চেতনা) এবং বিষয়গত (বস্তু, কল্পরূপ, ইত্যাদি) বিষয়ের সংযোগ স্থল।

একে বিশ্লেষণ করলেই আমরা আমাদের বিশুদ্ধ চেতনাকে (যা সব মানুষের মধ্যে উপস্থিত) বুঝতে পারবো এবং কী করে এই বিশুদ্ধ চেতনা জ্ঞানের বিষয়কে গঠন করে অথবা অর্থপ্রদান করে তা জানতে পারবো। আর এই জানাটিই হলো অবভাস-বিজ্ঞানের অভীষ্ট লক্ষ্য। হুসের্লের এমন চিন্তাধারা দর্শনের ইতিহাসে অভিনব। তাঁর দর্শন এই দর্শনের এক নবদিগন্ত খুলে দিয়েছে আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই অবভাস-বিজ্ঞানের এই নতুন চিন্তাধারা সমাজ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং এমনকি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাই অবভাস-বিজ্ঞানকে বুঝতে না পরলে বোধ করি যে কোন জ্ঞান-শাখার চর্চাই অসমাপ্ত থেকে যায়। হুসের্লের এই নবচিন্তাধারা থেকে একটি উপধারাও জন্ম নিল অনতিবিলম্বে। এই উপধারাকেই আমরা অস্তিত্ববাদ (existentialism) হিসেবে জানি। হুসের্ল বলেছিলেন যে অবভাসের প্রকৃত অস্তিত্ব (existence) আছে কি নেই, সে-বিষয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই, শুধু অবভাসের বৈশিষ্ট্য জানাই হবে দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিষয়ের সারসত্তা (essence) জানাই হবে দর্শনের মূল লক্ষ্য। অস্তিত্ববাদীগণ অন্য কথা বললেন। তাঁরা বললেন, যে কনো বিষয় সম্পর্কেই বলা যায় যে আমরা প্রথমে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানি এবং পরে জানতে পারি তার সারসত্তা। অস্তিত্ববাদীগণ তাই বিষয়ের অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য জানতে চাইলেন। অবভাস-বিজ্ঞানের প্রভাব যেমন অচিরেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়লো, তেমনি অস্তিত্ববাদের প্রভাবও বিশেষ করে দর্শনের অন্যান্য শাখায় এবং সাহিত্যের আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়লো। অস্তিবাদকে না বুঝতে পারলেও দর্শনের জ্ঞান রয়ে যায় অসমাপ্ত আর সাহিত্যের এক নবদিগন্ত থেকে যা অবগুণ্ঠিত।

পুস্তকখানিতে অতিসংক্ষেপে অবভাস বিজ্ঞান এবং অস্তিত্ববাদের মূল কথাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যে কেউ যেন বইখানি বুঝতে পারে, এমন সহজভাবে আলোচনা করার প্রয়াস নিয়েছি। বিশেষ করে দর্শন এবং সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী তাঁরা যদি এ-বই থেকে অন্ততঃ খানিকটা অনুপ্রাণিত হন অবভাস-বিজ্ঞান এবং অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে, তাহলে বলবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে, আশা পূর্ণ হয়েছে। প্রাজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে পুস্তকখানির পরবর্তি সংস্করণের জন্য সানুগ্রহ উপদেশ পেলে ধন্য হবো।

পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত করে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ডঃ কল্যাণ সেনগুপ্ত। তাঁর কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা রইলো। "অ্যাকাডেমিক এন্টারপ্রাইজ"-এর ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রী ইন্দু ভূষণ চক্রবর্তী বইখানি সাগ্রহে প্রকাশ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই. তাঁর মঙ্গল কামনা করি।

সুনীল কুমার সরকার

অবভাস-বিজ্ঞানের স্বরূপ ও সূত্র

বিবর্তনের ক্রমবিকাশের শেষ সোপানে যেদিন মানুষ এলো পৃথিবীতে, সেদিন সুপ্ত বিজ্ঞান বা চেতনা বিকশিত হলো মানুষের মধ্যে। বোধকরি সেদিন থেকেই মানুষের অনুসন্ধিৎসা ঃ বাইরে এই যে বর্ণালীমণ্ডিত বহুবিধ বস্তুসমূহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এ-গুলো কি সত্যি আছে, অথবা এ-গুলো চেতনার অন্তরস্থ শক্তিরূপিনী কল্পনার মায়াজাল? বস্তুকে সে স্পর্শ করলো, অনুভব করলো এবং বললো — না, বস্তু আছে। কিন্তু তার বিচার-শক্তি তাকে বাধা দিল। বলল ঃ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে তাতো সব সময় যথাথ হচ্ছে না? তাহলে ছলনাময় ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশ্বাস করি কী করে? ভাবনার জগতে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলতে লাগলো মানুষ, আজও তার নিস্তার নেই।

তার প্রশ্নের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যেতে লাগলো ঃ বস্তু কী? বস্তু কি অনন্ত? বস্তুর কি গুণাবলি আছে অথবা বস্তু এবং গুণাবলি একই বিষয়, অথবা গুণাবলি ভ্রমমাত্র? আমরা বস্তুকে যেমনভাবে দেখছি, বস্তু কি তেমন-ই, অথবা বস্তু-ও ভ্রম মাত্র? তাছাড়া, প্রত্যক্ষণ-যোগ্য নয় এমন বস্তু আছে কি? প্রশ্ন উঠলো ঃ অস্তিত্ব কি প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর করে? যদি করে থাকে, তাহলে যতক্ষণ বস্তুকে প্রথ্যক্ষণ করা হচ্ছে না, ততক্ষণ কি বস্তু থাকে না? আবার বস্তু কি একরূপ অথবা বহুরূপী? বস্তুগুলো কি পারমার্থিক দিক দিয়ে কারো দ্বারা সৃষ্ট, অথবা বস্তু স্বয়ম্ভু? ভারতের বৈদিক ঋষিবৃন্দ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকবৃন্দের এমনিতর হাজারো প্রশ্ন। মানুষ কখনো ভেবেছে, দিবাভাগে যা প্রত্যক্ষণ করা যাচ্ছে তা এক পৃথিবী, আর নিদ্রাকালে দেহ থেকে নির্গত হয়ে আত্মা আর এক জগতে বিচরণ করে, যাকে আমরা বলি স্বপ্ন। নৃতত্ত্ববিদগণের মতে আফ্রিকা ও মধ্য-আমেরিকার কোন কোন মনুষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যে আজও এমন ধারণা রয়েছে। কেউ কেউ প্লেটোর মতো বললেন, বাইরের এই জগৎ সত্য নয়, অন্য একটি জগতেব ছায়া মাত্র। এরপর প্লেটোর পথ অনুসরন করে ভাববাদীগণ বললেন যে বস্তু 'ভাবের' বা চেতনার সৃষ্টি। অন্যদিকে বস্তুবাদীগণ বাধা দিয়ে বললেন, বস্তুই পরমতত্ত্ব, বরং 'ভাব' বা চেতনা-ই বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আবার কেউ কেড 'ভাব' বা চেতনা এবং বস্তু উভয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করলেন। বস্তুকে বা বিশেষ বিশেষ জিনিষকে বলা হল দ্রব্য এবং গুণাবলির সমষ্টি। অভিজ্ঞতাবাদী লক্ (Locke) বললেন যে বস্তুর গুণাবলিকে দুটো বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে—মুখ্য গুণাবলি আর গৌণগুণাবলি। তিনি বললেন, মুখ্য গুণাবলি বস্তুর নিজস্ব এবং তাই আমরা সেগুলোকে যেমনভাবে দেখছি, সেগুলো ঠিক তেমনি। বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন

ইত্যাদি যেসব গুণাবলিকে আমরা কল্পনাতেও বস্তু থেকে পৃথক করতে পারি না, সেগুলো হলো মুখ্যগুণাবলি। পক্ষান্তরে বস্তুর রং, স্বাদ ইত্যাদি যেসব গুণাবলিকে আমরা আমাদের চিন্তায় বস্তু থেকে পৃথক করে ভাবতে পারি, সেগুলো হল গৌণগুণাবলি। লক্-এর মতে গৌণগুণাবলি আমাদের মনের গড়া, এগুলো বস্তুতে উপস্থিত নেই। বার্কলি (Berkeley) এ-কথা মেনে নিলেন না। তিনি বললেন যে মুখ্য ও গৌণ উভয় প্রকার গুণাবলিই আমাদের মনের গড়া। লক্ ও বার্কলির এই বিতর্ক অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) চিন্তাধারাকে কান্টের (Kant) দর্শনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিল।

লক্ ও বার্কলি বলেছিলেন যে গুণাবলি ব্যক্তি বিশেষের বৈশিষ্টের ওপর নির্ভরশীল। তবে এই বিশিষ্ট মানস, শারীরীক নয়। কারো মানসিক গড়ন একপ্রকার, তাই সে বিশেষ একটি রং-কে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করছে। ঐ গড়ন অন্য প্রকার হলে প্রত্যক্ষণও ভিন্ন হতো। কান্টের কথা সম্পূর্ণ অন্য রকম। তিনি বললেন যে আমরা কখনোই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারি না। তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে ভাববাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সমন্বয় করেছেন। বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা পাই তাকে তিনি অনুভূতি (sensation) বলেছেন। এগুলো সরাসরি আমাদের কাছে এসে হাজির হয় না — দেশও কালের (space এবং time) ভেতর দিয়ে আসে। আর তাই বস্তু থেকে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা পাই তাতে পরিবর্ত্তন আসতে পারে। আমরা জানি, কোন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে কোন বিষয় নিষ্ক্রমন করলে তাতে পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোজা কাঠিকে জলে বাঁকা দেখায়। তাছাড়া, আমাদের মন বা বুদ্ধিতে একটি অভিজ্ঞতা-পূর্ব (*a priori*) কাঠামো রয়েছে। কান্ট একে বলেছেন জ্ঞানাকার (categories of understanding)। আমরা কোন বস্তু দেখলেই এতে পরিমান অথবা অপর কোন বস্তুর সঙ্গে এর কারন কার্য সম্পর্ক অথবা এর অস্তিত্বের আবশ্যিকতা বা সম্ভাব্যতা ইত্যাদি, জেনে থাকি। অর্থাৎ পরিমান, কারন-কার্য সম্পর্ক, আবশ্যিকতা বা সম্ভাব্যতা ইত্যাদি না জানলে কোন বস্তুকেই আমরা বুঝতে পারি না। যে কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান হবার পূর্বেই এগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি না। তাই এগুলোকে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-পূর্ব শর্তাবলি বলা হয়। আমাদের অনুভূতিগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। একই বস্তুর রং প্রত্যক্ষণ করি চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কাঠিন্য প্রত্যক্ষণ করি ত্বক দিয়ে, স্বাদ অনুভব করি জিহবা-ইন্দ্রিয় দিয়ে। এই বিচ্ছিন্ন অনুভূতিগুলোকে একত্রিত না করতে পারলে বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করা সম্ভব হবে না। জ্ঞানাকারগুলো অনুভূতি-উপাত্তগুলোকে (data of sensation) একত্রিত ও

সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে এবং তাই আমরা বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করতে পারি, চিনতে পারি। আপেলটির রং, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি যদি বিচ্ছিন্নই থাকতো, তাহলে ওটি আপেল হতে পারতো না। যা হোক, কান্ট পরিমাণ (quality), সম্পর্ক (relation) ও প্রকাশ-ভঙ্গি (modality) — এই চার প্রকার জ্ঞানাকারের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে এই জ্ঞানাকারগুলোর উৎসস্থল হলো জ্ঞানের আদর্শ (Ideals of reason)। তাঁর মতে জ্ঞানের আদর্শ হলো ঈশ্বর। ঈশ্বর বিশুদ্ধ-বুদ্ধি (Pure Reason)। বিশ্বের সমস্ত কিছুকে এই বিশুদ্ধ-বুদ্ধি সংযোজিত করে রেখেছে। বুদ্ধি যেমন মানুষে রয়েছে, তেমনি রয়েছে সুপ্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে। আবার স্বাধীন অবস্থায় বুদ্ধি রয়েছে ঈশ্বররূপে। ঈশ্বর হলেন অতিবর্তী বিষয় (Transcendental Object)।

পরবর্ত্তী জার্মান দর্শন কান্টের দর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জিনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্‌টে (Fichte), শেলিং (Schelling) ও হেগেল (Hegel)-এর হাতে জার্মান ভাববাদী দর্শন উচ্চতমশিখরে পৌঁছেছিল। ফিক্‌টে বললেন, আমি যা কিছু ভাবি না কেন, আমার ভাবনার মূলে রয়েছে "আমি"। আমার অস্তিত্ব নিশ্চিত এবং আমিই এর সাক্ষী। ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের (Descartes) "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি" একরূপ উক্তি থেকে ফিক্‌টের উক্তি ভিন্ন। দেকার্ত বলেছিলেন যে "আমি চিন্তা করছি মানেই আমি আছি।" অর্থাৎ চিন্তার ওপর অস্তিত্ব নির্ভর করছে। কিন্তু ফিক্‌টে বললেন যে "আমি" থেকেই সবকিছুর শুরু। যখনই বলছি "আমি চিন্তা করছি", তখনই তো "আমি" এসে যাচ্ছে। কাজেই ফিক্‌টের মতে "আমি" থেকে অথবা "আমার অস্তিত্ব" থেকেই দার্শনিক ভাবনার শুরু করতে হবে। তিনি আরও বললেন, শুধু "আমি আছি" বললেই হবে না। আমি ছাড়া আর কিছু না থাকলে, অর্থাৎ "অ-অমি" (not-I) না থাকলে আমি কখনো "আমি" বলতে পারতাম না। কাজেই "অ-আমি" বা অনাত্মা আছে বলেই আত্মা (I অথবা Ego) আছে। তবে ফিক্‌টের মতে আত্মা হলো আত্মার ভাবনা। আর আত্মা ও অনাত্মা চিৎ-স্বরূপ পরমাত্মার দুটি প্রকাশ বা মাত্রা (dimension) মাত্র। ফিক্‌টের সমসাময়িক শেলিং বললেন, অনাত্মা না থাকলে যদি আত্মা মিথ্যে হয়ে যায়, তাহলে অনাত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা চলে না। ফিক্‌টে অনাত্মাকে কাল্পনিক বলেছিলেন আর শেলিং অনাত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলেন। তবে ফিক্‌টের মতো শেলিং-ও বলেছেন যে আত্মা ও অনাত্মা এক পরম এবং সর্বব্যাপী (Absolute) চৈতন্য থেকে উদ্ভুত।

একরূপ দার্শনিক বাতাবরনে এগিয়ে এলেন জর্জ উইলাম ফ্রেডারিক হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) (১৭৭০-১৮৩১)। ফিক্‌টে ও শেলিং এই

দুজন সহকর্মীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরে তিনি তাঁর স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করেছেন। হেগেল কান্টের জ্ঞানাকারগুলোকে সৎ (real) বললেন। কান্ট বলেছিলেন যে জ্ঞানাকারগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞান হয়, কাজেই প্রকৃত বস্তুকে বা জগৎ-কে জানবার কোন উপায় নেই। ফলে কান্টের মতে অধিবিদ্যা অসম্ভব। হেগেল প্রতিবাদ করে বললেন, জ্ঞানাকারগুলোর মাধ্যমে আমরা যা পাচ্ছি তা-ই পারমার্থিক (আপেক্ষিকভাবে), তা-ই সৎ এবং তা-ই জগৎ। তাছাড়া, হেগেল এই জ্ঞানাকারগুলোকে কান্টের মতো সীমিত সংখ্যক বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে জ্ঞানাকার অসংখ্য। এই অসংখ্য জ্ঞানাকার সর্বব্যাপী (Absolute) ধারণা (Idea) রচনা করেছে। জ্ঞানাকারগুলোর ক্রমবর্ধমান বহিঃপ্রকাশ বস্তুময় জগৎ। কাজেই চিন্তাজগতের জ্ঞানাকারগুলো এবং জ্ঞানাকার-বহিঃপ্রকাশস্বরূপ বস্তুজগৎ অভিন্ন। অর্থাৎ জীব ও জগৎ এক সর্বব্যাপী ধারণার (Absolute Idea) প্রকাশ। হেগেল বলেন, যা ধারণা, তা-ই সৎ; আবার যা সৎ, তা-ই ধারণা।

এ-পর্যন্ত দর্শনের ইতিহাসের ক্ষানিকটা আলোচনা করা হলো এজন্য যে হেগেল হলেন জার্মানি তথা ইউরোপীয় ভাববাদী-দর্শনের শিরোমণি এবং তাঁর দর্শন হলো অবভাস-বিজ্ঞানের পটভূমি। কিন্তু হেগেলকে বুঝতে হলে তাঁর পূর্ববর্তী দর্শনের কিছুটা আভাসের প্রয়োজন আছে। যা হোক, হেগেল থেকে চারটি প্রধান দর্শন-শাখা উৎপন্ন হয়েছে। হেগেলের ভাববাদী দর্শনের উচ্চতম শিখর থেকে স্রোতস্বিনীর মতো নেমে আসেনি এগুলো, বরং ভাববাদী দর্শনের প্রতিবাদ স্বরূপ এদের আর্বিভাব। প্রথমতঃ হেগেলপন্থী তরুণ দার্শনিকগণ (Young Hegelians) থেকে জন্ম হলো কার্ল-মার্ক্স-এর (Karl Marx) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের (dialectical materialism)। দ্বিতীয়তঃ, হেগেলের প্রান্তিক যুক্তিবাদের কঠোর সমালোচনা করে শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) এবং নিট্‌শে (Nietzsche) বললেন যে যুক্তির চেয়েও অধিক শক্তিশালী হলো মনের নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious)। তাঁরা বললেন যে সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে এক মহাশক্তিধর অচেতন ইচ্ছাশক্তি (Will Power)। এই ইচ্ছাশক্তি যুক্তিকে গ্রাহ্য করে না, বরং যুক্তিই একে অনুসরণ করতে বাধ্য। তবে নিটশে এই ইচ্ছা-শক্তিতে প্রভুত্বকামীতা দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষ এবং পশু-পাখীর মধ্যে এই অচেতন ইচ্ছা-শক্তি প্রভুত্বকমিতার রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করছে। তৃতীয়তঃ, হেগেল অস্তিত্বের চেয়ে সত্তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন অধিক। তাঁর কথা ছিল, কোন কিছু সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে সেটির সম্প্রত্যয় বা ধারণা (concept), তারপর আমরা ভাবি সেটির অস্তিত্ব আছে কি নেই। হেগেলের এ-কথার প্রতিবাদ করে অস্তিত্ববাদীগণ (existentialistts) বলেন যে অস্তিত্ব পূর্বগ এবং সত্তাসার (essence) অনুগ।

গাছের অসংখ্য পাতার ফাঁকে কী যেন একটা আছে বলে মনে হচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে, ওটি বোধহয় একটি পাখী; আবার বোধ হচ্ছে, ওটি বুঝি দুটি পাতার আড়াআড়ি ভাবে অবস্থান। সুতরাং জিনিসটির অস্তিত্ব আগে জানা গেলো এবং পরে জানা গেলো সেটির স্বরূপ বা সত্তা। চতুর্থতঃ হেগেল বলেছিলেন যে প্রত্যক্ষ এবং বস্তুর মধ্যে কোন মূলগত প্রভেদ নেই, কারণ সর্বব্যাপী সম্প্রত্যয়ের দিক থেকে ভাবলে যা প্রত্যক্ষণ করা হচ্ছে তা সবই সেই সর্বব্যাপী সম্প্রত্যয়ের (Absolute Idea) প্রকাশ। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে ভ্রম হয় কেন? হেগেল বললেন, ভ্রম বলে কিছু নেই — বস্তুর আংশিক প্রত্যক্ষণ বা বিভাবকে (aspect) বস্তুর পূর্ণপ্রত্যক্ষণ বা স্বরূপরূপে জানাই হলো ভ্রম। বস্তুকে আংশিকাভাবে জানা হলো বস্তুর অবভাসকে জানা, আর বস্তুর স্বরূপকে পূর্ণভাবে জানলে বোধগম্য হবে যে বস্তু কতকগুলো সম্প্রত্যয়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়। কাজেই বস্তু চেতনার ওপর নির্ভরশীল। অথবা বলা যেতে পারে যে বস্তু চেতনা-স্বরূপ বা চেতনার প্রকাশ (সর্বব্যাপী সম্প্রত্যয়ের প্রকাশ)। লক্ ও কান্ট যাকে জ্ঞানাতীত বলেছিলেন, সেই পরমদ্রব্য (ultimate substance) হলো হেগেলের মতে সর্বব্যাপী চেতনা বা সম্প্রত্যয় (Aboslute Idea)। হেগেলের দর্শন বিশুদ্ধ যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার ওপর নয়। এড্‌মণ্ড হুসের্ল (Edmund Husserl) বলেন যে দার্শনিকগণ এতকাল অবধি কোন একটি বিষয়েও একমত হতে পারেননি, কারণ তাঁদের দার্শনিক পদ্ধতি শুধুমাত্র যুক্তি-ভিত্তিক ছিল, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক নয়। আরাম কেদারায় বসে নিমীলিত-নেত্রে দর্শন-চিন্তা করলে কোন দার্শনিক বিষয়েই যথার্থ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি দর্শনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে আহ্বান জানালেন। হেগেলের বিরুদ্ধে হুসের্লের অভিযোগ এই যে হেগেলের দর্শন অভিজ্ঞতার ওপর এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হুসের্লের প্রতিবাদের আরও একটি কারণ হলো এই যে হেগেল সহ সমস্ত পূর্বসূরী দার্শনিকগণই কিছু কিছু পূর্বানুমান (presuppositions) স্বীকার করে দর্শনচিন্তা শুরু করেছেন। হেগেলেও এরূপ পূর্বানুমান রয়েছে। তাঁর জ্ঞানাকারগুলো অবশ্যই পূর্বানুমান। হেগেল চেতনাকে বিশ্লেষণ না করেই ধরে নিলেন যে জ্ঞানাকারগুলো আমাদের চেতনায় পূর্ব থেকেই রয়েছে। এখানেই হুসের্লের আপত্তি।

ইতঃপূর্বে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ বস্তুর অস্তিত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, মন বা চেতনা তাঁদের নিকট ছিল গৌণ। তাঁদের মতে বস্তু স্বয়ম্ভু, স্বাধীন ও গুণান্বিত। বস্তু যেমন, চেতনা তেমন-ই তাকে জানে। বস্তু ও চেতনা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কোন কোন বস্তুবাদী আবার বলেছেন যে চেতনা বস্তুজাত। লক, বার্কলি, হিউম প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদীগণ (empiricists) বলেছিলেন যে মন বা চেতনা নিষ্ক্রিয়,

আরশির মতো। বস্তুর প্রতিচ্ছবি আরশিতে যেমন অবিকল পড়ে, মনের ওপরও পড়ে তেমনি। আর তা থেকেই বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়। অপর দিকে দেকার্ত, স্পিনোজা (Spinoza), লাইবনিজ (Leibnitz) প্রমুখ বুদ্ধিবাদী (rationalist) দার্শনিকগণ বলেছিলেন যে জ্ঞান বুদ্ধিতে বা মনে বা চেতনায় পূর্ব থেকেই উপস্থিত থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দর্শনের ইতিহাসে একদিকে চলেছে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের দ্বন্দ্ব এবং অপরদিকে চলেছে ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। কান্ট এই দু প্রকার দ্বন্দ্বেরই সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফলকাম হননি। জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে তিনি বলেছিলেন যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন আছে, বুদ্ধিরও তেমনি। বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে উপাত্ত পেয়ে থাকি সেগুলোকে বুদ্ধি জ্ঞানাকারগুলোর সাহায্যে সাজিয়ে নিলে তবেই জ্ঞান জন্মায়। আবার অধিবিদ্যার দিক থেকে তিনি বলেন যে প্রকৃত পরমতত্ত্বকে (noumenon অথবা *Ding an Sich*) আমরা কখনোই জানতে পারবো না। পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ-কে তিনি বলেছেন অবভাস (phenomenon)। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয় অগম্য বহির্জগৎ ("Noumenal world") এবং আমাদের অগম্য আভ্যন্তরিণ জগৎ-এর বা আত্মার ("noumenal self") সংমিশ্রনে। কাজেই অবভাসিক বস্তু-জগৎ (reality) ক্ষানিকটা নির্ভর করে প্রত্যক্ষকারীর ওপর। এরূপ মতবাদকে বলা হলো দর্শনের ইতিহাসে (পাশ্চাত্ত্য) কোপার্নিকান বিপ্লব (Copermican revolution)। কিন্তু কান্টের দার্শনিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হলো না, কারণ পরমতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝতে পারলাম না। তাছাড়া, তিনি দর্শনে কিছু পূর্বানুমান (presuppositions) মেনে নিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেছেন যে দ্বাদশটি জ্ঞানাকার রয়েছে এবং এগুলোর সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপায়গুলোকে সুসামঞ্জস্য পূর্ণ করে তুলি। অপর দিবে হেগেল কান্টের জ্ঞানাকারগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন অত্যধিক। তিনি বললেন যে, জ্ঞানাকার বারটি নয়, অসংখ্য এবং এই জ্ঞানাকারগুলোই পরমতত্ত্ব। জ্ঞানাকারই পরিদৃশ্যমান জগৎ রচনা করে। এর ফলে বস্তুময় জগৎ উবে গেলো। কাজেই হেগেলও এ-দ্বন্দ্বদ্বয়ের সমাধান করতে পারেন নি। বরং বলা যায় যে তিনি তাঁর যুক্তি-জাল এবং ভাষার দুর্বোধ্য এ্যাট্রিক (Attic) শিল্পের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়কে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছেন মাত্র। এ তাঁর নিজের কথা থেকেই বোঝা যায়। নিজের দার্শনিক রচনা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি জার্মানীবাসীকে দর্শন শেখাতে চেষ্টা করেছেন যাতে তারা জার্মান-ভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে পারে।

এ-পর্যন্ত দ্রষ্টব্য এই যে দেকার্তের পূর্বসূরী অথবা তাঁর পর থেকে হেগেল অবধি কোন দার্শনিকই চেতনার (consciousness) বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে

আসেননি। সবাই বিষয়ী-বিষয় (subject-object) দ্বৈত সত্তার কথা বলেছেন। বিষয়ী বা চেতনা আছে, কাজেই বিষয়কেও থাকতে হবে — এরূপ একটি স্বতঃসিদ্ধ সবাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, বিষয়ী থাকলে বিষয় থাকতেই হবে কেন? বিষয়ী বা চেতনা কি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্ম-কেন্দ্রিক হতে পারে না? আরও প্রশ্ন হতে পারে : না হয় ধরে নেয়া গেলো যে বিষয়ীকে অস্তিত্বশীল হতে হলে বিষয়কেও অস্তিত্বশীল হতে হবে, কিন্তু বিষয়কে গুণসম্পন্ন দ্রব্য (substance with attributes) বলে ধরে নেয়া হলো কেন? এরূপ অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কেউই এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেননি। সবাই এসব জিনিসগুলোকে পূর্ব থেকেই মেনে নিয়েছেন; যেন এসব জিনিস সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। হুসের্ল-পূর্ব দর্শনে এরূপ কিছু পূর্বানুমান ধরে নিয়ে দার্শনিক আলোচনা শুরু হয়েছে।

দর্শনের লক্ষ্য যদি বিজ্ঞানের পূর্বানুমানগুলোর বিশ্লেষণ এবং সেগুলোর যাথার্থ নির্ধারন করা হয়ে থাকে, তাহলে দর্শনকে হতে হবে পূর্বানুমানহীন (presuppositionless)। আগে থেকেই কতকগুলো বিষয়কে মেনে নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত করলে ঐ সিদ্ধান্ত ঐ বিষয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। যে কোন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এরূপভাবে কিছু প্রমাণবিহীন স্বতঃসিদ্ধ বিষয় মেনে নেয়া হয়ে থাকে। কাজেই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো সর্বব্যাপী (absolute) নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউক্লিডের জ্যামিতি কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্বতঃসিদ্ধগুলো সত্য না হলে ইউক্লিডের গোটা জ্যামিতিই মিথ্যে প্রমাণিত হবে। কাজেই দর্শনকে যদি একটি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে দর্শন-চিন্তা শুরু করতে হবে কোনরূপ পূর্বানুমান ছাড়াই। তবে কোন কোন দার্শনিক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে একেবারে কোনরূপ পূবানুমান ছাড়া কোন প্রকার দার্শনিক চিন্তাই সম্ভব নয়। কিন্তু হুসের্ল এদেঁর সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেছেন যে দর্শনের ইতিহাসে কোনরূপ অগ্রগতিই এ-পর্যন্ত সম্ভব হয়নি একারণে যে এ-অবধি দার্শনিকগণ পূর্বানুমানকে ভিত্তি করে দর্শনচিন্তা শুরু করেছেন। হুসের্ল আরও বলেন যে এই পূর্বানুমানগুলো চেতনায় পূর্বেই উপস্থিত থাকে। সুতরাং দার্শনিক আলোচনার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে চেতনাকে বিশ্লেষণ করে এই পূর্বানুমানগুলোর স্বরূপ জানা। যেমন, বিষয়ী-বিষয় দ্বৈতসত্তা একটি পূর্বানুমান। চেতনাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, কেন বিষয়ীর কথা ভাবলেই বিষয়ের কথা স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। হুসের্ল বলেন যে দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিৎ চেতনার বিশ্লেষণ। এর কারণ এই যে বাহ্য ও আন্তর জগতে যা কিছু আছে, তা-ই আছে চেতনায়। কলমদানিটি দেখতে পাচ্ছি আমার বাইরে, কিন্তু ঐটি রয়েছে আমার চেতনায়-ও। প্রতিবাদ হতে

পারে ঃ কলমদানিটির ছবি অথবা ধারনাটি চেতনায় থাকতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত কলমদানিটি তো অবশ্যই বর্হিজগতে টেবিলের ওপর রয়েছে। কিন্তু এই যে বলা হলো, 'প্রকৃত কলমদানিটি তো বর্হিজগতে টেবিলের ওপর রয়েছে' — এ-কথাটিও তো আমার চেতনাই বলে দিচ্ছে? আবার ধরা যাক, এই মুহূর্তে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে বর্হিজগৎ এবং ঐ কলমদানিটি আমার কাছে শূণ্য হয়ে গেলো। কেউ বলতে পারেন, আমার চেতনায় বর্হিজগৎ এবং কলমদানিটি লোপ পেলে কী হবে, আর আর অগণিত মানুষের চেতনায় বর্হিজগৎ ও কলমদানিটি অবশ্যই পূর্বানুরূপ অস্তিত্বশীল থাকবে। কিন্তু আমার সংজ্ঞা ফিরে এলে আমি একথা মেনে নেবো কী করে? আমরা এরূপ ভাবি না যে আমার সংজ্ঞা লোপ পেলে শুধু আমার কাছে থেকে বর্হিজগৎ সরে যায় না, বর্হিজগতের অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে লোপ পায়। আমরা বরং বিশ্বাস করি যে বর্হিজগৎ আমার চেতনা থেকে দূরে সরে গেলেও অপর ব্যক্তিবর্গের চেতনাসমূহে পূর্বানুরূপ অস্তিত্বশীল থাকবে। আমরা এরূপ ভাবি, কারণ এরূপ ভাবা আমাদের চেতনার বা চিন্তার পূর্বানুমান। এসব পূর্বানুমানগুলোর যাথার্থ আছে কি নেই এসম্পর্কে আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে। আর এ না হলে, দার্শনিক সিদ্ধান্ত কখনোই যথার্থ হবে না। আবার চেতনায় উপস্থিত পূর্বানুমানগুলোর যাথার্থ বিচার করতে হলে প্রয়োজন চেতনার স্বরূপকে অনুধানবন করা। হুসের্ল বলেছেন, দর্শনের ইতিহাসে হাজার বছর পেরিয়েও আমরা আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারিনি, কারণ যে চেতনা আমাদের দার্শনিক চিন্তার পশ্চাতে রয়েছে, যে চিন্তা দার্শনিক চেতনার সাহায্যে করে থাকেন, অর্থাৎ যে চেতনা চিন্তার কর্তা, তার স্বরূপ আমরা জানতে আগ্রহী হইনি।

দর্শনের ইতিহাসে হুসের্ল-এর পূর্বে একমাত্র দেকার্ত-ই (Descartes ঃ ১৫৯৬-১৬৫০) চেতনাকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকারশ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা স্ববিরোধাত্মক। কারণ, এখানে সন্দেহ-ক্রিয়ার কর্তা-ও তিনি স্বয়ং। তাই তাঁর বিখ্যাত বচন ঃ 'আম চিন্তা করি, তাই আমার অস্তিত্ব আছে।' তিনি বললেন, দার্শনিক চিন্তার এই হলো প্রথম সন্দেহাতীত ফসল — আমার অস্তিত্ব বা আমার চেতনার অস্তিত্ব আছে। পরক্ষণেই তিনি নিজেকে বা নিজের চেতনার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করে ঈশ্বর এবং বহির্জগৎ-কে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে হুসের্লের পূর্বে বোধকরি এই প্রথম আত্ম-চেতনা বিশ্লেষণের প্রয়াস। পক্ষান্তরে, ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে আমরা প্রথম থেকেই আত্ম-চেতনা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা দেখতে পাই। যা হোক, দেকার্তের প্রায় তিন শ' বছর পর হুসের্ল প্রায় একই

সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনিও বললেন যে চেতনাকে বিশ্লেষণ করে দর্শনকে এগোতে হবে। তবে হুসের্ল দেকার্তের চেতনা-বিশ্লেষণকে মেনে নিলেন না। তিনি বললেন, দেকার্ত যে আত্মার (self) বা চেতনার বিশ্লেষণ করেছিলেন সে আত্মা হলো অভিজ্ঞতা-লব্ধ (empirical), শুদ্ধ চেতনা (pure consciousness) নয়। অভিজ্ঞতা-লব্ধ আত্মা বা চেতনায় জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং পূর্বানুমান রয়েছে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো অভিজ্ঞতাগুলোকে এবং পূর্বানুমানগুলোকে সত্য বলে মেনে নিই। কাজেই অভিজ্ঞতা-লব্ধ আত্মা বিশুদ্ধ চেতনা নয়। এ-বিষয়টি পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। কারণ এ-বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে না পারলে হুসের্লের অবভাস-বিজ্ঞানকে উৎকৃষ্টভাবে অনুধাবন করা যাবে না।

উনিবিংশ শতাব্দির শেষ এবং বিংশশতাব্দির প্রথমভাগে জার্মানীতে অবভাস-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। কোনরূপ পূর্বানুমান ছাড়া বস্তুর অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরমসত্তাকে জানবার এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। একেই বলা হলো অবভাস-বিজ্ঞান। সমকালীন অবভাস-বৈজ্ঞানিক-সদৃশ চিন্তাধারাকে শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে এবং একে সুসংহত করে গণিতবিদ-দার্শনিক এড্‌মুন্ড হুসের্ল তাঁর নিজস্ব অবভাস-বিজ্ঞান প্রবর্তন করেন। তাঁর *Philosophy of Arithmetic* নামক পুস্তকে তিনি সংখ্যাকে বস্তুর ধারনার সারসত্তা (essence) হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এখানে প্লেটোর প্রভাব সুস্পষ্ট। যা হোক, হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞান এখান থেকেই শুরু। তারপর *Logical Investigations* নামক পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে যুক্তিবিজ্ঞানের আকারগুলো মনোবৈজ্ঞানিক নয়, এগুলোর স্বাধীন সত্তা আছে। এসব আকারগুলোর (forms) সামান্য নিঃশর্ত (universal categorical) স্বভাব আছে এবং তা অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুধাবন করা যায়। তাঁর পরবর্তি বিখ্যাত পুস্তক হলো *Cartesian Meditations*। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে রেঁনে দেকার্তের প্রথম সন্দেহাতীত জ্ঞেয় বিষয় প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি-আত্মা নয়, বরং এ-হলো অতিবর্তী বিষয়ী-সত্তা (transcendental subjectivity)। হুসের্লের পর তাঁকে অনুসরন করে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবভাস-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। অস্তিত্ববাদের জন্মও অবভাস-বিজ্ঞানের মূল ভূমিতেই। বর্তমানে অবভাস-বিজ্ঞান ও অস্তিত্ববাদ সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মনতত্ত্ব, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

অবভাস-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

অবভাস-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অথবা বর্ণনা বা ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। *Encyclopaedia Britanica*-তে বলা হয়েছে যে অবভাস-বিজ্ঞান দর্শন ও

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত এমন একটি পদ যা কোন কিছুর বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির বা অবভাসের (phenomenon) অনুধাবন করে। অবভাসের অন্তরালে অবস্থিত বস্তুর কারণ-কার্য সম্পর্কীয় উৎপত্তিস্থল, প্রকৃত গঠন, যাথার্থ্য ইত্যাদির অনুসন্ধান অবভাস-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ঠিক বিপরীত ("a term used in philosophy and psychology to denote a study of the varying forms in which something appears or is manifested, as opposed to studies of causal origins, real constitution, significance, etc., which go beyond what is apparent"). এ্যানটনি কুইনটন *20th Century* নাম নির্দেশিকা পুস্তকে লিখেছেন যে হুসের্ল অবভাস-বিজ্ঞানকে কেবলমাত্র মানসিক বিষয় ও ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের পদ্ধতি হিসেবেই ভাবতেন না। তাঁর (হুসের্ল-এর) মতে এ হলো এক নতুন ভাববাদী দর্শনের ভিত্তি-ভূমি ("....Husserl came to think of phenomenology not merely as a method of philosophical inquiry into the nature of the mind's objects and activities but as the basis of a new kind of idealistic metaphsics.")। আইসেন্‌ক (H. J. Eysenck) ও অন্যান্যরা তাঁদের *Encyclopedia of Psychology*-এ বলেছেন যে অবভাস-বিজ্ঞান হলো অবভাস বা প্রকাশ-সম্পর্কীয় মতবাদ। অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবভাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বস্তুকে বা বিষয়কে অনুধাবন করা হয়। এই অবভাসগুলো ইন্দ্রিয়সঞ্জাত বহির্জগতের হতে পারে, এমনকি মানসিক গঠন বা প্রক্রিয়ার দৃশ্যমান প্রতীক-কল্প হতে পারে ("The theory of *phenomena*, or *appearances*.The phenomenological approach is to examine an object form the standpoint of its appearance. This may be apprearance in the external world of the senses, apprehensibility in the experimental sphere, or even the symbolic visual representation of mental structures or process")। ড্যাগোবার্ট ডি রুনস (Degobert D. Runes) তাঁর *The Dictionary of Philosophy*-তে বলেছেন যে 'অবভাস-বিজ্ঞান' পদটিকে বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে 'Phenomenologie' পদটি বহুবিধ বিষয়ের অনেক ধারনাকে বোঝাতো। যেমন, ল্যাম্বার্ট (Lambert) তাঁর *Nine Organon* (১৭৫৪) নামক পুস্তকে 'অবভাস-বিজ্ঞান' পদটিকে অভিজ্ঞতার ভিত্তি-স্বরূপ অবভাস সম্পর্কীয় মতবাদ অর্থে ব্যবহার করেছেন। ইম্যানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) তাঁর *Metaphysische Aufansgrunde der Naturwissenschaft*-এ (১৭৮৬) অবভাস-বিজ্ঞান পদটিকে প্রায় একই অথচ সীমিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। হেগেল তাঁর ১৮০৭ সালে প্রকাশিত *Pehnomenologie des Geistes* নামক পুস্তকে এই পদটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। হ্যামিলটন (Hamilton) তাঁর লেখা ঐ একই নামযুক্ত পুস্তকে (১৮৫৮) 'অবভাস-বিজ্ঞান' কথাটিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি

লিখেছেন যে আমরা যদি মনকে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণ ও সামান্যীকরণের কর্তা হিসেবে মনে করি, তাহলে আমাদের একটি মানসিক বিজ্ঞান তৈরী করতে হবে, এবং একে বলা হবে 'মনের অবভাস বিজ্ঞান'। আবার মরিৎস ল্যাজরাস (Moritz Lazarus) তাঁর *Laben der Seele* (১৮৫৬-৫৭) নামক পুস্তকে অবভাস-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অবভাস-বিজ্ঞান মানসিক জীবনের ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিতে প্রয়াসী, আর ঐ ঘটনা সমূহের কারনিক (Causal) ব্যাখ্যাদিতে চেষ্ট করে মনোবিজ্ঞান। উইলিয়ম রীজ (William Rease) তাঁর *Dictionary of Philosophy and Religion*-এ অবভাস-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ "সাধারনভাবে, মানুষের চেতনায় পরিব্যাপ্ত অবভাসগুলোর বিশ্লেষণ-কেন্দ্রিক দর্শনের অনুগামী হলো অবভাস-বিজ্ঞান।" (In general, phenomenology is an appraoch to philosophy centering on analysis of the phenomena which flood man's awareness.)। জেমস ড্রেভার (James Drever) তাঁর *A Dictionary of Psychology*-এ বলেছেন যে অবভাস-বিজ্ঞানহলো "সচেতন অভিজ্ঞতাকেঅভিজ্ঞ তারূপে সুশৃঙ্খলভাবে অনুসন্ধান করা" ("the systematic investigation of conscious experience as experience")। নিকোলাস রাইট (Nicholas Wright) সম্পাদিত *Understanding Human Behavior* (vol. XIX)-এ বলা হয়েছে যে অবভাস-বিজ্ঞান হলো এমন একটি বিষয় যা বহির্জগৎ থেকে আগত অনুভূতিকে মস্তিষ্ক কেমন করে ব্যাখ্যা করে এবং উপলব্ধি করে তা অনুধাবন করে ("The study of mental processes and the way in which the brain interprets and understands sensations from the external world.")। কফার ও এ্যাপলে (Coffer and Appley) তাঁদের *Motivation : Theory and Practice* নামক পুস্তকে অবভাস-বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে অবভাস-বিজ্ঞান সাধারণতঃ অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করার দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝায় ("Phenomenology refers usually to a way of looking at experience")। উইলিয়ম আর্নেষ্ট হকিং (William Ernest Hocking) তাঁর বই *Types of Philosophy*-তে বলেছেন ঃ "জার্মানীতে হুসের্ল যে অবভাস-বিজ্ঞানের কথা বলেছেন তা আমাদেরকে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে 'ঐ' এবং 'কী' — অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ, অথবা ধারনাগত বিষয় এবং অস্তিত্বমূলক বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ করতে এবং মনোযোগ থেকে অস্তিত্বমূলক উপাদন পরিত্যাগ করতে বলেছে, যাতে মনোযোগে উপস্থিত ধারনার অর্থ ও অভিপ্রেত নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করা যায় ("The 'phenomenology' proposed by Edmund Husserl in Germany, invites us to distinguish in experience the 'that' and the 'what', i.e., the particular and the general, or the existential and the conceptual, and to discard from atrention the existential element in

order to note with precision the meaning or intention of the *concepts* there involved.") । এড্‌উইন জি. বোরিং (Edward G. Boring) তাঁর বিখ্যাত বই *A History of Experimental Psychology*-এ অবভাস-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে অবভাস-বিজ্ঞান বলতে বোঝায় "সম্ভাব্য ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক পক্ষপাতিত্ব নিয়ে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার বর্ণন।" ("It means the description of immediate experience, with as little scientific bias as possible.")

নর্মান এল. মান্ (Norman L. Munn) ও তাঁর সহলেখকগণ তাঁদের বই *Introduction to Psychology*-এ গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে অবভাস-বিজ্ঞানীদের অনেকটা এক করে দেখেছেন। এঁরা বলেছেন যে মনোবিজ্ঞানীগণ সাধারণত: মানব জীবনের বিষয়গত বৈশিষ্ট অনুধাবন করতে আগ্রহী এবং এর জন্য তাঁরা অভিজ্ঞতাকে পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু কিছু কিছু মনোবিজ্ঞানী অন্য সবার মতো অভিজ্ঞতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং সহজতর উপাদানে বিশ্লেষণ না করে সামগ্রীকভাবে অভিজ্ঞতার বর্ণনায় আগ্রহী। তাঁদের এরূপভাবে অভিজ্ঞতার বর্ণনা করার প্রচেষ্টা-সম্পর্কীয় আলোচনাকেই অবভাস-বিজ্ঞান বলা হয়। এ্যন্টনি ফ্লু-এর (Anthony Flew) *Dictionary of Philosophy*-এ বলা হয়েছে অবভাস-বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষকারী স্বীয় চেতনার, বিশেষ করে স্বীয় বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার, যত্নবান পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এরূপ পর্যবেক্ষণে আন্তর মানসিক প্রক্রিয়ার ফলাফল এবং বহির্জগতের কারনাদি সম্পর্কীয় সমস্ত পূর্বানুমানকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। এরূপ প্রচেষ্টা মনোবৈজ্ঞানিক বলে মনে হলেও হুসের্ল বলেছেন যে এরূপ প্রচেষ্টা হলো মনের বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে উপস্থিত যে সারসত্তা (essence) অথবা অর্থ (meaning) রয়েছে, তার অভিজ্ঞতাপূর্ব অনুসন্ধান। জেমস এম. ইডি (James M. Edie) পিয়েরে থিভেনাজ-এর (Pierre Thivenaz) বই *What Is Phenomenology*-এর 'ভূমিকায়' অবভাস-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে অবভাস-বিজ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ক বিজ্ঞান-ও নয়, আবার জ্ঞাতা-বিষয়ক বিজ্ঞান-ও নয়। এ হচ্ছে অভিজ্ঞতা-বিষয়ক বিজ্ঞান। অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমরা যে বিন্দুতে বিষয়ী ও বিষয় মিলিত হয়, তার ওপর মনঃসংযোগ করি। বিষয়ও বিষয়ীর অভিপ্রেত (intention) অনুযায়ী গঠিত হয়। কাজেই এখানে আমরা চেতনায় যে অভিপ্রেত রয়েছে, তার অনুধাবন করি। শুধুমাত্র বিশেষ একটি বস্তুই (বা অবভাসই) অভিপ্রেত বিষয় (intended) নয়, গোটাজগৎ-টি অভিপ্রেত বিষয়। সুতরাং বলা যায় যে অভি প্রেত জগতের বিশেষ একটি অভিপ্রেত বিষয়ের বিশ্লেষণই অবভাস বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। জেম্‌স ইডি-এর ব্যাখ্যা হুসের্ল-এর ব্যাখ্যার অনুরূপ। কুয়েন্টিন লাওয়ার (Quentin Lauer) তাঁর *Phenomenology : Its*

Gensis and Prospect নামক পুস্তকে বলেছেন যে অবভাস বিজ্ঞানী যে চেতনার বর্ণনাদিতে আগ্রহী সে চেতনা পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানীর চেতনা নয়। হুসেল-এর অনুসন্ধেয় চেতনার একপ্রকার সত্তা রয়েছে। এই সত্তা বস্তু থেকে উপজাত হয়, আর এরূপ সত্তাকে অনুসন্ধানকারী প্রত্যক্ষভাবে পেতে পারে। এরূপ সত্তাকে জার্মান ভাষায় বলা হয় *Bewusstsein* যার অর্থ হলো এই যে এরূপ সত্তা বস্তু জ্ঞাপিত হবার সময় বস্তুতে আবির্ভূত হয়। এখানে সত্তা ও সত্তার জ্ঞাপিত হওয়া (being and being Known) অভিন্ন বা সমার্থক। কাজেই বস্তুর জ্ঞাপিত হবার অভিজ্ঞতার মধ্যেই বস্তুর সত্তাকে জানবার চাবিকাঠি রয়েছে ("the only key we have to being is in experiencing its being known.") সবশেষে, পিটার কোয়েস্টেনবাউম (Peter Koestenbaum) তাঁর *'Religion in the Tradition of Phenomenology'* শীর্ষক রচনাতে বলেছেন যে দর্শনের সাধারন জ্ঞানাকারগুলো অর্থহীন, কারণ এগুলো মানুষ ও জগৎ সম্পর্কে কিছু পূর্বানুমান-সাপেক্ষ। মানুষের আবেগ ও মেজাজ জগৎ-কে পরিবর্তিত করে দেয়। কিন্তু এরূপ পরিবর্তিত জগতে মেজাজ এবং ঘটনা (mood and fact) অবশ্যই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে না, থাকে পরস্পর যুক্ত অবস্থায়। কাজেই জ্ঞানাকারগুলো বাস্তব জগতে প্রয়োজ্যে নয়। অবভাস-বিজ্ঞান তাই অযথা-অনুমান-সাপেক্ষ জগৎ-সম্পর্কীয় মতবাদগুলোকে অগ্রাহ্য করে এবং কেবলমাত্র প্রাথমিক জাগতিক অভিজ্ঞতাকে বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে বা বুঝতে চায়। এভাবে অবভাস-বিজ্ঞান তার নিজস্ব বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

হুসের্ল-প্রদত্ত অবভাস-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

এবার হুসের্ল স্বয়ং অবভাস-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা কেমন করে দিয়েছেন, তা দেখা যাক। তিনি তাঁর বিখ্যাত Ideas নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "যে বিশুদ্ধ অবভাস-বিজ্ঞানের কাছে আমরা পৌঁছুতে সচেষ্ট হয়েছি, অপরাপর বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যার অবস্থান আমরা স্পষ্ট করতে আগ্রহী এবং যাকে আমরা দর্শনের মূলভিত্তিভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি, তা প্রকৃত পক্ষে এক নতুন বিজ্ঞান। এই নতুন বিজ্ঞান তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য আমাদের সাধারণ চিন্তা প্রণালী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং এই কারনে এতকাল অবধি এর কোন উন্নতির আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। অবভাস-বিজ্ঞানের নিজের পরিচয় সে 'অবভাস-বিজ্ঞান-রূপে' দিয়ে থাকে। অনেক দিন যাবৎ আমাদের জানা অন্যান্য বিজ্ঞানগুলো অবভাস নিয়েই অনুসন্ধান করেছে। যেমন বলা হয়েছে যে মনোবিজ্ঞান হলো মানসিক বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হলো মানসিক 'অবভাস' অথবা অবভাসের বিজ্ঞান। আবার এমনিভাবে ইতিহাসে আমরা কখনো কখনো ঐতিহাসিক অবভাসের এবং সাংস্কৃতিক

বিজ্ঞানগুলোতে সাংস্কৃতিক অবভাসের, এবং অনুরূপভাবে যেসব বিজ্ঞান বাস্তবিক ঘটনাবলি নিয়ে (বস্তু নিয়ে) আলোচনা করে, সেগুলোতেও অবভাসের কথা শুনে থাকি। এখন যেহেতু 'অবভাস' শব্দটি এসবক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এবং এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়ে থাকে, তাই একথা নিশ্চিত যে অবভাস-বিজ্ঞান-ও এই সমস্ত 'অবভাস' এবং সেগুলোর অর্থ নিয়ে পর্যালোচনা করে। তবে এই পর্যালোচনা হয়ে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, যার ফলাফল পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানগুলোতে ব্যবহৃত 'অবভাস' শব্দটির অর্থসমূহকে একটি বিশিষ্টভাবে রূপান্তরিত করে দেয়। এমনিভাবে রূপান্তরিত অর্থাবলিই কেবলমাত্র অবভাসবিজ্ঞানের বলয়ে প্রবেশ করতে পারে।" হুসের্ল আরও বলেন যে অবভাস-বিজ্ঞান হবে মূলতঃ একটি প্রত্যক্ষানুরূপ কাল্পনিক বিজ্ঞান (eidetic science) ঃ "বিশুদ্ধ বা অতিবর্তী অবভাস-বিজ্ঞান একটি ঘটনা-বিজ্ঞান (বস্তু-বিজ্ঞান) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে না, হবে একটি সারসত্তার বিজ্ঞান হিসেবে ('প্রতক্ষানুরূপ কাল্পনিক' বিজ্ঞান হিসেবে), যে বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, 'সারসত্তার জ্ঞান' (*Wesenserkenntine*)-কে প্রতিষ্ঠিত করা, এবং কোনরূপ ঘটনা তার বিষয়ে একেবারেই থাকবে না।"

অবভাস-বিজ্ঞানের স্বরূপ

দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাসে হুসের্ল-ই সর্বপ্রথম জ্ঞানতত্ত্বের মূল সমস্যাটি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জ্ঞাতার চেতনাকে ভালোভাবে বুঝতে না পারলে জ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারনা হবে না। হুসের্ল-এর পূর্বে দেকার্ত (Descartes) এ-সমস্যাটি কিছুটা বুঝতে পেরেই জ্ঞাতার (cogito) অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহাতীত হতে চেষ্টা করেছিলেন। জ্ঞাতা বা চেতনার অস্তিত্ব থাকলে তবেই জ্ঞান সম্ভব। সন্দেহকরণ পদ্ধতিতে (method of doubt) তাই তিনি জ্ঞাতা বা আত্মার অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু তাঁর ভুল হয়েছিল এখানে যে তিনি বুঝতে পারেননি যে বস্তু ভিন্ন জ্ঞাতা বা চেতনা থাকতে পারে না। তাছাড়া, দেকার্ত বুঝতে পারেনি যে জ্ঞাতা বা আত্মা অভিজ্ঞতা-লব্ধ (empirical)। বিভিন্ন অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং অপরাপর ব্যক্তির আমার সম্পর্কে যে ধারণা (অর্থাৎ আমার একটি দেহ এবং একটি আত্মা আছে) তা থেকেই আমার নিজের আত্মার (বা চেতনার) ধারনা হয়েছে। দেকার্ত ধরেই নিয়েছেন যে আমার একটি আত্মা (বা চেতনার) এবং একটি দেহ রয়েছে। কাজেই দেকার্তের আত্মার ধারণা পূর্বানুমানহীন (presuppositionless) নয়। হুসের্লের এখানে আপত্তি রয়েছে। তিনি বলেন যে দর্শন যদি কিছু পূর্বানুমানকে মেনে নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে, তাহলে দার্শনিক সিদ্ধান্ত যথার্থ হবে না। কাজেই আমার একটি আত্মা অবশ্যই রয়েছে

একথা ধরে নিয়ে দর্শনের অভিযান শুরু করলে কখনোই সত্যে পৌঁছানো যাবে না। তাই হুসের্ল বারংবার বলেছেন যে দর্শনকে হতে হবে পূর্বানুমানহীন। তিনি বলেছেন যে দর্শনকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে — দর্শনকে হতে হবে একটি সত্যব্রত বিজ্ঞান বা কঠোর বিজ্ঞান (rigorus science)। আর দর্শনকে একটি কঠোর বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে দর্শনকে করতে হবে পূর্বানুমানহীন। যা হোক আত্মার বা চেতনার বা মনের অস্তিত্ব পূর্ব :থেকেই স্বীকার করে নিয়ে দেকার্ত তার দর্শনকে ভ্রান্তিযুক্ত করে তুলেছেন। দেকার্তের পর ইম্যানুয়েল কান্ট-ও (Immanuel Kant) তাঁর দর্শনে পূর্বানুমান মেনে নিয়েছেন। কান্ট জ্ঞানের দুটো উপাদানের কথা বলেছেন — ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তু থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ (data) এবং মনে উপস্থিত জ্ঞানাকারসমূহ (categories of understanding)। কান্ট একত্ব, বহুত্ব, সমগ্রত্ব, প্রকৃত সত্তা, অভাব, সীমিত সত্তা ইত্যাদি ১২টি জ্ঞানাকার বা বৌদ্ধিক প্রকারকে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি কেবল মনের অস্তিত্বকে মানেননি, মনের ভেতরে এই জ্ঞানাকারগুলো রয়েছে, এ-ও মেনেছিলেন। মনে জ্ঞানাকারগুলো উপস্থিত আছে—এ-ও একটি পূর্বানুমান। কাজেই দেকার্তের এবং কান্টের দর্শনে পূর্বানুমান রয়েছে। তাছাড়া, উভয়ের দর্শনেই দেখা যাচ্ছে যে মন বা আত্মা বা চেতনা বিশুদ্ধ নয়। পূর্বেই দেখেছি যে দেকার্তের আত্মা হলো অভিজ্ঞতা-লব্ধ, কাজেই বিশুদ্ধ নয় — এতে রয়েছে অনুভূতি এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতা। আবার কান্টের আত্মা বা চেতনাও বিশুদ্ধ নয়, কারণ তিনি ধরে নিয়েছেন যে চেতনায় জ্ঞানাকারগুলো রয়েছে।

চেতনার বিশুদ্ধতা বলতে কী বোঝা যাবে? চেতনাকে বিশুদ্ধ হতে হলে তাকে পূর্বানুমানমুক্ত হতে হবে, পূর্বানুমানযুক্ত নয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলো সর্বদাই পূর্বানুমানযুক্ত থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তির কিছুটা লাল রঙের অনুভূতি হলো। কিন্তু ব্যক্তিটি এখনো বুঝতে পারেনি ঐ লাল রঙটি কোন বস্তুর। তবু, ঐ বস্তুটি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাপূর্ব কিছু ধারনা অবশ্যই রয়েছে। যেমন, ব্যক্তি জানে যে ঐ লাল রঙ্ অবশ্যই একটি বিশেষ স্থানে এবং কালে অবস্থান করছে; জানে যে ঐ রঙটি ঐ ব্যাক্তির অভিজ্ঞতা বা চেতনার ওপর নির্ভর করে না, বরং স্বাধীনভাবে কোনবস্তুর আধারে উপস্থিত আছে; এবং জানে যে ঐ রঙটি যে বস্তুর আধারে রয়েছে সেবস্তুটির একটি বিশেষ আকার থাকবেই। ঐ ব্যক্তির এসব ধারনা এবং অন্যান্য অনুরূপ ধারনা হলো অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারনা বা পূর্বানুমান। আমরা এসব পূর্বানুমানগুলোকে সঙ্গে নিয়েই বাস্তব (সংবৃত) জগতের সম্মুখীন হই। এমনিভাবে জগতের সঙ্গে জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্পর্কের সময় আমাদের স্বভাবগত পূর্বানুমান গ্রহণ করাকে হুর্সেল 'স্বাভাবিক প্রবণতা' (natural attitude) বলেছেন।

পূর্বানুমান গ্রহণ করে জগৎ-কে জানলে, সে জানা বা জ্ঞান কখনোই যথার্থ হবে না, কারণ সেক্ষেত্রে পূর্বানুমানগুলোর দ্বারা আমাদের চেতনা বা আত্মা সংক্রামিত হয়। জগৎ ও চেতনার মধ্যে সেক্ষেত্রে পূর্বানুমানগুলো এক প্রাচীর তৈরী করে রাখে। এমনি জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকটে অবভাস-বিজ্ঞান আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। অবভাস-বিজ্ঞান জ্ঞান-ক্রিয়ার পথ থেকে পূর্বানুমনগুলোকে সরিয়ে দিয়ে মূল ('raw') অভিজ্ঞতা বা অবভাসের কাছে আমাদেরকে পৌঁছে দিতে পারে। অবভাস-বিজ্ঞান ঘটনায় বা বস্তুতে আগ্রহী নয়, ঘটনা বা বস্তুর অন্তরালে যে সারসত্তা রয়েছে তাতেই আগ্রহী। কিন্তু এর পূর্বে, অর্থাৎ ঘটনা বা বস্তুর সারসত্তা জানবার পূর্বে, আমাদের জ্ঞাতা বা চেতনার (cogito) স্বরূপ বুঝতে হবে। হুসের্ল চেতনাকে এক গুচ্ছ কর্ষিকার (tentacle) সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। চেতনা কখনোই চেতনা হতে পারে না, যদি সে বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না থাকে। আমি চেতন, অথচ কোনকিছু অম্পর্কেই চেতন নই, এমন হতে পারে না। হুসের্ল তাঁর শিক্ষক ব্রেন্টানো-এর (Brentano) কাছে থেকে এই তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। কাজেই বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চেতনার অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। বস্তু বা ঘটনা চেতনায়ই উপস্থিত থাকে। চেতনা যেন আধার আর বস্তু বা ঘটনা যেন আধেয়। কাজেই চেতনাকে জানতে হলে চেতনায় অবস্থিত বস্তু বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। দেকার্তের সঙ্গে হুসের্ল-এর এখানেই বড় পার্থক্য। দেকার্ত বস্তু-নিরপেক্ষ অর্থাৎ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন 'চেতনার' বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু হুসের্ল বলেন যে চেতনাকে বুঝতে হতে চেতনার বহির্ভূত 'কোনকিছুর' (অবভাসের) সচেতনতাকে বুঝতে হবে। চেতনার বহির্ভূত এই 'কোনকিছু' চেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং চেতনার উপাদান বা অংশ হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক, বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত চেতনার বর্ণনাকেই হুসের্ল অবভাস-বিজ্ঞান বলেছেন।

অবভাস বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুসের্ল লিখেছেন যে আমরা সাধারণতঃ বস্তু, চিন্তা (thought) অথবা মূল্যের (value) ওপর মনোনিবেশ করে থাকি। যেমন, আমরা ভাবি যে একটি বিশেষ বস্তু আকারের দিক দিয়ে বেশ বড়, অথবা ভাবি যে কোন ব্যক্তির চিন্তাধারা ঠিক নয়, অথবা বলি যে গণতন্ত্র সব দেশের মানুষের কাছে মূল্যবান নয়। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে মানসিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং যে মানসিক ক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব বস্তু, চিন্তা ও মূল্যের উপলব্ধি হয়, তার ওপর আমরা মনোনিবেশ করি না। অন্তর্দর্শনের সময় (in reflection) এরূপ 'মানসিক ক্রিয়ার' অভিজ্ঞতা হয়। মানসিক ক্রিয়ার ওপর মনঃ-সংযোগ করা অসম্ভব মনে হলেও প্রযত্ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে এরূপ মনঃ-সংযোগ সম্ভব হয়ে ওঠে।

অভ্যাস হয়ে গেলে এমনভাবে মনঃ-সংযোজন প্রতিটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। বস্তু, মূল্য, চিন্তা, উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য না করে, আমরা বিষয়ীর এ-সব বিষয় (বস্তু, মূল্য ইত্যাদি) সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয় তাতে মনোযোগ নিবদ্ধ করি, যাতে অভিজ্ঞতার মধ্যে অর্থাৎ বিষয়ীর চেতনায় এ-সব বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। হুসের্ল-এর এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করে জেরোম এ. শেফার (Jerome A. Shaffer) তাঁর বই *Philosophy of Mind*-এ অবভাস-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেন যে আমরা যদি যথার্থভাবে আমাদের চেতনায় মনঃ-সংযোগ করি, তাহলে আমরা আমাদের মানসিক বিষয়ের স্বরূপ এবং আত্মিক সত্তাকে বুঝতে পারবো। শেফার বলেছেন যে এভাবে চেতনায় মনঃ-সংযোগ করতে হলে কতকগুলো প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। হুসের্ল তাঁর রচনাতে এমন কতকগুলো প্রক্রিয়া আমাদেরকে দিয়েছেন।

অবভাস-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

পিটার কোয়েস্টেনবাউম (Peter Koestenbaum) অবভাস-বিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন ঃ

১. ''সংক্ষেপে, অবভাস-বিজ্ঞান মনে করে যে পরিবেশ বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে জগৎ-সম্পর্কীয় সমস্ত জ্ঞান আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে।''

২. ''চরম অভিজ্ঞতাবাদের আদর্শ অনুসরন করে অবভাস-বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার বর্ণনায় মনোনিবেশ করে।''

৩. ''অবভাস-বিজ্ঞান মনে করে যে বর্ণনার সাধারণ জ্ঞানাকারগুলো দর্শনের দিক দিকে অযথার্থ এবং এজন্য এগুলো আমাদেরকে বিপথে চালিত করতে পারে......... ।''

অবভাস-বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত নীতিসমূহ

অবভাস-বিজ্ঞান মূলতঃ একটি বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যাসমূহ। অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে অবভাস-বিজ্ঞান কয়েকটি পদ্ধতিগত নীতি অনুসরণ করে। এই নীতিগুলো হলো ঃ

১. ***বন্ধনী-পদ্ধতি (epoché)*** ঃ হুসের্ল তাঁর শিক্ষক ব্রেন্টানোর কাছে থেকে শিখেছিলেন যে সব জীবন-সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতাই (lived experience) অভিপ্রেতমূলক (intentional)। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাসমূহ সর্বদাই আমাদের মনোভাব, বিশ্বাস, সংস্কার, মতবাদ, প্রবণতা প্রভৃতির দ্বারা রঞ্জিত হয়ে থাকে। অবভাস-বৈজ্ঞানিক বন্ধনী-পদ্ধতির সাহায্য আমরা এইসব বিষয়গুলোকে

সাময়িকভাবে বন্ধনীর সাহায্যে মূল অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করে রাখি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, একটি আপেলের অভিজ্ঞতা হলেই আমরা ভাবি যে অথবা বিশ্বাস করি যে ঐ আপেল নামক একটি বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। আমরা ভাবি যে ঐ আপেলটির রঙ্‌টিরও প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। আমরা আরও মনে করি যে ঐ আপেলটি আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল অর্থাৎ আমরা ঐ আপেলটি প্রত্যক্ষ না করলেও ওটি অস্তিত্বশীল থাকতো। এসব হলো আমাদের বিশ্বাস বা সংস্কার অথবা পূর্বানুমান। হুসের্ল বার বার বলেছেন যে এমনিভাবে কতকগুলো বিশ্বাস বা সংস্কার অথবা পূর্বানুমানকে স্বীকার করে নিয়ে বিষয়কে জানতে গেলে জ্ঞান কখনো যথার্থ হবে না।

অবভাস-বৈজ্ঞানিক বন্ধনী-পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এই এইসব পূর্বানুমানগুলোকে বন্ধনীর সাহায্যে মূল অভিজ্ঞতা (আপেলটির ইন্দ্রিয়ানুভূতি মাত্র) থেকে পৃথক করে রাখি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধারণতঃ এসব বিষয়গুলোকে সত্য বলে এবং মূল অভিজ্ঞতার উপাদান বলে ধরে নিই। কিন্তু অবভাস-বৈজ্ঞানিক বন্ধনী-পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা এগুলোর প্রকৃত অস্তিত্ব এবং যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করি। মনে করি, এগুলো সত্য বা যথার্থ না-ও হতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতায় উপস্থিত মনোভাব, বিশ্বাস, সংস্কার, মতবাদ, প্রবণতা ইত্যাদিকে সত্য এবং অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্নযোগ্য নয় বলে ভাবা হলো আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমরা এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে যথার্থ অথবা অযথার্থ কিছুই ভাবি না। আমরা শুধু সাময়িকভাবে এই প্রবণতাকে দূরে সরিয়ে রাখি। শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা ব্যষ্টি বস্তু সম্পর্কেই আমরা এরূপ করি না, গোটা জগৎ-টা সম্পর্কেও আমরা এই বন্ধনী-পদ্ধতি প্রয়োগ করি। যেহেতু জগতের অন্ততঃ অস্তিত্ব আছে বলে আমাদের যে বিশ্বাস তা-ও স্বাভাবিক প্রবণতার একটি অংশ, সেহেতু এরূপ বিশ্বাসকেও আমরা বন্ধনী-বদ্ধ করি। স্বাভাবিক প্রবণতাকেএমনিভাবে সম্পূর্ণরূপে বন্ধনী-বদ্ধ করলে আমাদের চেতনা প্রকৃত সত্য (apodictic truth) গ্রহণে সমর্থ হয়।

২. ***ভাবগত লঘুকরণ (eidetic reduction)*** ঃ বন্ধনীপদ্ধতি প্রয়োগের ফলে চেতনা বা আত্মা বিশুদ্ধ অতিবর্তী চেতনা বা আত্মায় (transcendental consciousness or ego) পরিণত হয়। চেতনা তখন বিশুদ্ধ থাকে, কারন চেতনায় তখন পূর্বনুমানগুলো উপস্থিত থাকে না। বিশুদ্ধ চেতনার অভিপ্রেত-ও (intention) তখন বিশুদ্ধ থাকে অর্থাৎ অভিপ্রেত তখন আমাদের আবেগ, অনুভূতি, সংস্কার ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত থাকে না। এমতাবস্থায় বিষয়ী (knower) জীবন-সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার বা বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ অংশ (ঘটনা বা বস্তু) ভাবগত

লঘুকরনের জন্য বেছে নিতে পারে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল বৈশিষ্ট্যাবলি অনুধাবন করার জন্যই ভাবগত লঘুকরন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। দার্শনিক তখন বাস্তব কোন অভিজ্ঞতাকে তাঁর বিশুদ্ধ অভিপ্রেত সহকারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বা পরিপ্রেক্ষিত (perspective) থেকে অবলোকন করতে থাকেন। যেমন, স্মৃতি অথবা অবাধ কল্পনার (fantasy) সাহায্যে অবলোকন করতে থাকেন। এখানে অবাধ কল্পনাই সাধারণতঃ বেশী সাহায্য করতে পারে। কারণ, অবাধ কল্পনার সাহায্যে দার্শনিক ঐ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্ভাব্য নানা ররকম ভাবে লক্ষ্য করতে থাকেন, বাস্তব অভিজ্ঞতাটির কেন্ কোন্ বৈশিষ্টগুলোকে কল্পনায় অন্য রকম ভাবা যায় না। বুঝতে হবে যে যে বৈশিষ্টগুলোকে কল্পনায়ও অন্যরকম ভাবা যায় না সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই ঐ বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল বৈশিষ্ট্য। বাস্তব অভিজ্ঞতার এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলো অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অভিন্ন-সত্য রূপে পাওয়া যাবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার এই অ-পরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় ঐ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাব-কল্প (eidos)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি কমলাকে সামনে রেখে (অভিজ্ঞতা) ভাবতে লাগলাম যে ওটির আকার ক্রমশঃ বড় করা হচ্ছে। এমনিভাবে আকারকে কল্পনায় বড় করতে করতে একসময় দেখা যাবে যে ঐ কাল্পনিক বস্তুটিকে আর কমলা বলা যাচ্ছে না। এ-থেকে বুঝতে হবে যে কমলার একটি বিশেষ (সাধারণ) আকার আছে। কমলাটির এই আকার যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, যাবে অন্তর্দৃষ্টির (intuition) সাহায্যে। এমনিভাবে একটি কমলাকে প্রত্যক্ষ করে কমলা শ্রেণীর মূল বৈশিষ্টগুলো — যেমন, আকার, রঙ, স্বাদ, ইত্যাদি — জানা যেতে পারে। কমলা শ্রেণীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রে কমলার ভাবকল্প সৃষ্টি করে।

৩. ***গঠনমূলক সমস্যা (problem of constitution)*** ঃ অবভাস-বৈজ্ঞানিক বন্ধনী প্রয়োগের ফলে দেখা গেছে যে একমাত্র বিশুদ্ধ অতিবর্তী বিষয়ীত্ব-ই (subjectivity) পরম (absolute) বিষয়, এবং কেবলমাত্র একেই সম্পূর্ণভাবে এবং সন্দেহতীতভাবে (apodictically) জানা সম্ভব। এই বিশুদ্ধ অতিবর্তী বিষয়ী বা চেতনা জগৎ-কে অবভাসরূপে জানে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ-অতিবর্তী-বিষয়ী-সাপেক্ষ বিষয়রূপে জেনে থাকে। পক্ষান্তরে, আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতায় আমরা জগৎ-কে বিষয়রূপে অর্থাৎ বিশুদ্ধ-অতিবর্তী-বিষয়ী নিরপেক্ষ বিষয়রূপে জানি। সত্যি কথা বলতে কি, হুসের্ল বিষয়ী-বিষয়ের এই সমস্যার সমাধান সন্তোষজনকভাবে করতে সক্ষম হননি। যা হোক, তিনি তাঁর *Cartesian Meditations* নামক পুস্তকে লিখেছেন যে পরমভাবে প্রতিষ্ঠিত একাগ্র বিজ্ঞান হিসেবে দর্শনের উদ্দেশ্য হবে.ঃ প্রথমতঃ সম্পূর্ণভাবে আত্ম-বিশ্লেষণাত্মক। এর লক্ষ্য হবে কেমন করে আত্মা নিজেকে গঠিত করে, নিজের মধ্যে নিজেকে গঠিত করে, এবং নিজের জন্য নিজেকে গঠিত করে — এসব

সবিস্তারে দেখানো। আর এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হবে বিস্তৃততর অর্থে আত্মবিশ্লেষণ। দর্শনকে দেখাতে হবে আত্মগঠনের পর আত্ম স্বয়ং কেমন করে অনাত্মাকে (non-ego) গঠন করে — কেমন করে আত্মা আত্মা-ভিন্ন 'অপর কিছুকে' গঠন করে, যা বিষয়ী নয়, বিষয়। তবে এসব গঠিত অনাত্মার অধিষ্ঠান হবে আত্মা স্বয়ং অর্থাৎ এদের অস্তিত্বমূলক যাথার্থ্য থাকবে আত্মাতেই।

বিষয়টিকে একটু স্পষ্ট করে বোঝানো যাক। বিশুদ্ধ অতিবর্তী চেতনা সর্বদাই অবভাসের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কারণ চেতনা কখনো বিষয় ছাড়া থাকতে পারে না। ধরা যাক, আমার বিশুদ্ধ চেতনা একটুকরো সাদা কাগজের অবভাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অবভাস-বিজ্ঞান কখনোই বাস্তবিক পক্ষে সাদা কাগজটি আছে কি নেই, একথা ভাবে না অথবা এসম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু একটুকরো সাদা কাগজ আমার সামনে রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য, যেহেতু আমার চেতনা সাদা কাগজের টুকরোটি জানতে পারছে। হুসের্ল বলেন যে ঐ সাদা কাগজের টুকরোটি আমার চেতনাই তৈরী করেছে। কাগজের টুকরোটি হলো অবভাস। কাজেই অবভাস আমার বিশুদ্ধ চেতনাই তৈরী করে। হুসের্লের গঠনমূলক সমস্যা হলো, আমার বিশুদ্ধ চেতনা কেমন করে ঐ সাদা কাগজের টুকরোটি বা তার অবভাসটি গঠন করলো? হুসের্ল জ্ঞানাকারগুলোকে (categories) অস্বীকার করেছেন। কারণ, তিনি বলেন যে জ্ঞানাকারগুলো অবশ্যই পূর্বানুমান। কান্ট বা দেকার্ত কোনরূপ বিচার না করেই এগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। একথা ঠিক যে জ্ঞানাকারগুলোকে মেনে নিলে অবভাসকে বা বস্তুকে ব্যাখ্যা করা বরং সহজতর হয়। কাজেই এগুলোকে অস্বীকার করায় হুসের্ল-এর গঠনমূলক সমস্যা অধিকতর জটিল হয়ে পড়লো। যা হোক, হুর্সেল জানতে চাইলেন, বিশুদ্ধ চেতনায় এমন কী কী বিষয় আছে যেগুলো আবশ্যিক (necessary) এবং যেগুলো এই অবভাসগুলোকে গঠন করে? তিনি বললেন যে চেতনাই অবভাস গঠন করে এবং চেতনাই অবভাস প্রত্যক্ষণ করে। অর্থাৎ তাঁর মতে জ্ঞান-ক্রিয়া (noetic activity) এবং জ্ঞান (noema) ভিন্ন নয়। আপেল নামক অবভাসটি আমার চেতনা প্রত্যক্ষণ করছে, আবার ঐ আপেল নামক অবভাসটি গঠন-ও করেছে আমারই চেতনা। আপেল নামক অবভাসটির অবশ্যই একটি অর্থ (meaning অথবা *Sinn*) আছে। এই অর্থও আমার চেতনাই ঐ বিষয়টিতে অর্পণ করেছে। একটি অবভাসে আপেল নামক অর্থ আরোপ করা না হলে আমরা বলতে পারি না যে এটি আপেলের অবভাস। হুসের্ল-এর সমস্যা হলো বিশুদ্ধ চেতনা কেমন করে এই অর্থ সৃষ্টি করে? যে কোন অবভাসেরই কোন না কোন অর্থ রয়েছে। অর্থ না থাকলে অবভাস অবভাসই হতে পারতো না। সুতরাং হুসের্ল যথার্থই বলেছেন যে বিশুদ্ধ চেতনাই অবভাস গঠন করে এবং বিশুদ্ধ চেতনাই

অবভাস অবলোকন করে।

৪. **অতিবর্তী ভাববাদ** ***(transcendental idealism)*** **:** হুসের্ল নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে দর্শনের লক্ষ্য হবে অতিবর্তী বিষয়ীত্বের (subjectivity) এবং এর গঠনমূলক ক্রিয়ার (constitutivee acts) সংব্যাখ্যান। এভাবে তিনি দর্শনকে অতিবর্তী ভাববাদের স্তরে উন্নীত করেছেন।

চেতনার উপাদান

পেরী (Perry) তাঁর *Philosophy of the Recent Past* নামক পুস্তকে বলেছেন যে হুসের্ল চেতনার তিনটি উপাদনের কথা বলেছেন : ক্রিয়া (act), বিষয় (object), ও আধেয় (content)। হয়তো পেরীকে অনুসরণ করেই অধ্যাপক ধীরেন্দ্র মোহন দত্ত *The Chief Currents of Contemporary Philosophy*-এ লিখেছেন যে অর্থবহ চেতনার অবভাসকে হুসের্ল ছ'টি উপাদানে বিভক্ত করেছেন : এক, অহং বা আত্মা, যে বিষয়ে অর্থ আরোপ করে; দুই, আত্মার অর্থ-পূর্ণ মনোভাব বা প্রবণতা; তিন, উপাত্ত, যার সাহায্যে আত্মা অর্থ সৃষ্টি করে; চার, প্রক্রিয়া (চিহ্ন বা প্রকাশভঙ্গী), যার মাধ্যমে আত্মা উপাত্ত গ্রহন করে; পাঁচ, আত্মার অর্থ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য; এবং ছয়, এই অর্থ বহন করার জন্য একটি বিষয়। অধ্যাপক দত্ত হুর্সেল-এর এই ছ'টি উপাদানকে অবভাস-বিজ্ঞানের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন।

অবভাস-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

অবভাস-বিজ্ঞানের পরিকল্পনার (programme) সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পরিকল্পনার বেশ খানিকটা মিল থাকলেও, এই দুটো বিষয় এক নয়। অবভাস-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে নিম্নে কিছু পার্থক্য দেখানো হলো :

১. প্রথমত : অবভাস-বিজ্ঞান একটি ভাবগত-বিজ্ঞান (eidetic science)। এখানে বস্তুগত বা বাস্তবিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় না। ব্যক্তির চেতনার ওপর বস্তুর ক্রিয়া থেকে উপজাত অবভাসই অবভাস-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অন্যদিকে, মনোবিজ্ঞান বাস্তব বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করে। ইন্দ্রিয়ের ওপর জগতের প্রভাবই মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়।

২. দ্বিতীয়ত : অবভাস-বিজ্ঞান একান্তভাবে একটি বর্ণনামূলক বিষয়। বিশুদ্ধ চেতনা, চেতনায় উপস্থিত অবভাস ও চেতনার অবভাস রচনার ক্রিয়া-পদ্ধতির বর্ণনাই অবভাস-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে দৈহিক ও মানসিক ঘটনাবলীর কারনিক (casual) সম্পর্ক নিয়েই মুখ্য আলোচলা হয় থাকে।

৩. তৃতীয় ঃ অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই মনোবিজ্ঞানও কতকগুলো স্বতঃ সিদ্ধ (axioms) বিনা বিচারে (এগুলোর যাথার্থ্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে না দেখেই) মেনে নিয়ে পরীক্ষণ-পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণ বচন (general propositions) প্রতিষ্ঠাতে প্রয়াসী। কিন্তু অবভাস-বিজ্ঞান কোনরূপ স্বতঃসিদ্ধে বিশ্বাসী নয়। হুসের্ল অবভাস বিজ্ঞানকে একটি চরম বা কঠোর (rigorous) বিজ্ঞানে উন্নীত করতে অভিলাষী ছিলেন। তাই তিনি বিনা অনুসন্ধানে স্বতঃ সিদ্ধ গ্রহণকে অযথার্থ মনে করতেন। তিনি বলেছেন যে বরং এই স্বতঃ সিদ্ধগুলোর বর্ণনাও হবে অবভাস-বিজ্ঞানের অপর একটি উদ্দেশ্য।

৪. চতুর্থত ঃ অবভাস-বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের তুলনা করলে বলতেই হবে যে মনোবিজ্ঞানের চেয়ে অবভাস-বিজ্ঞান অধিকতর ভিত্তিমূলক। অবভাস-বিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানেরও ভিত্তিস্বরূপ মনে করা যেতে পারে।

৫. পরিশেষে, অবভাস-বিজ্ঞান একটি অতিবর্তী (transcendental) বিষয়। বস্তু বা বাস্তবিক ঘটনা এর আলোচ্য বিষয় নয়, বস্তুর অতীত যে অবভাস বা চেতনা, তা-ই এর অনুসন্ধেয় বিষয়। পক্ষান্তরে, মনোবিজ্ঞান অনুবর্তী (immediate) বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। জগতের সঙ্গে বাস্তব প্রাণীর দৈহিক অথবা মানসিক সম্পর্ক এর অনুসন্ধেয় বিষয়।

তবে, মনোবিজ্ঞান ও অবভাস-বিজ্ঞান উভয়ই মানসিক ঘটনা অথবা বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করে। মরিৎস ল্যাজারাস (Moritz Lazarus) বলেন যে তথাপি এ-দুটোর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। অবভাস-বিজ্ঞান মানসিক ঘটনার কেবলমাত্র বর্ণনা দিয়ে থাকে, কিন্তু মনোবিজ্ঞান দৈহিক ও মানসিক ঘটনার মধ্যে যে কারনিক সম্পর্ক রয়েছে তা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। তবু বলা যেতে পারে যে যেহেতু উভয়ের অনুসন্ধানের বিষয়ই মানসিক ঘটনা, সেহেতু এ-দুটো বিষয়ের মধ্যে কিছুটা মিলও আছে। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো যেমন অবভাস-বিজ্ঞানের বর্ণনায় সাহায্য করতে পারে, তেমনি অবভাস-বিজ্ঞানের বর্ণনা মনোবিজ্ঞানের ধারনাগুলোকে যাথার্থ্য প্রদান করতে পারে।

অবভাস-বিজ্ঞান ও অবভাসবাদ

'অবভাস' (phenomenon) পদটির একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই পদটিকে এ্যারাটাস (Aratus) (২৭৫ খৃষ্টপূর্ব)-এর রচিত ফাইনোমিনা (Phainomena) নামক ১,১,৫৪ ছত্রের কবিতার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা না হয়। আধুনিক কালে অবভাস বলতে আমরা বচন (judgement) তৈরী করার পূর্বেই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত বহির্জগতের বিষয়কে বুঝে থাকি। কিন্তু হুসের্লের পূর্বে এই

পদটি প্রযুক্তি-পরিভাষায় পরিণত হয়নি। অনেক দার্শনিকের মতে অবভাস বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়-উপাত্ত (sense-datum)। জার্মানি ভাষায় লেখা কান্টের রচনার ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে অনেকে অবভাস বলতে জ্ঞানাকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুসংহত উপাত্তগুলোকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু অবভাস-বিজ্ঞানে 'অবভাস' শব্দটি এ সব অর্থে ব্যবহার করা হয় না।

যা হোক, অবভাসবাদ (phenomenalism) হলো বস্তু-প্রকাশের (appearance) আলোচনা, অবভাসের আলোচনা নয়। অবভাসবাদ অনুযায়ী বস্তু তার বস্তু-প্রকাশের অন্তরালে কোন অতিন্দ্রীয় (mysterious) বিষয় নয়। যদি তা-ই হতো তাহলে বস্তু-জগৎ জ্ঞানের অতীত হতো। অবভাসবাদ বহির্জগতের প্রত্যক্ষণ-সম্পর্কীয় বিষয়। এর মূলবিশ্বাস এই যে বস্তু-সম্পর্কীয় বচনগুলোকে বাস্তবিক অথবা সম্ভাব্য অনুভূতি-সম্পর্কীয় বচনে, অথবা অনুভূতি-উপাত্ত বা বস্তু-প্রকাশ সম্পর্কীয় বচনে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কারন, বস্তু কতকগুলো অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। টেবিলের ওপরে রাখা কলমটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্পর্শ করা না হলেও আমরা জানি যে কলমটিতে কাঠিন্য রয়েছে, কারণ পূর্বে ওটিকে স্পর্শ করে কাঠিন্য অনুভব করেছিলাম। সুতরাং কাঠিন্য কলমটির সম্ভাব্য অনুভূতি-উপাত্ত। আবার, পুনরায় স্পর্শ করেও বলতে পারি যে কলমটিতে কাঠিন্য রয়েছে। এমনিভাবে বস্তুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-উপাত্ত বা অনুভূতি-উপাত্ত (যেমন রং, আকার, ওজন ইত্যাদি) সংগ্রহ করে আমরা কলম নামক বস্তুটির ধারণা তৈরী করতে পারি। কারণ অনুভূতি সমূহ আর বস্তুটি অভিন্ন। একটি বিশেষ আকার, রং, ওজন, কাঠিন্য ইত্যাদি অনুভূতির সমষ্টিই প্রকৃতপক্ষে হলো কলমটি। কিন্তু এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অবভাসবাদ অনুযায়ী কলমটির এসব গুণাবলির পশ্চাতে এগুলোর আধার রূপে অপর কোন দ্রব্য নেই।

পক্ষান্তরে, অবভাস-বিজ্ঞান বস্তুর বাস্তবিক অনুভূতিতে আগ্রহী নয়। কোন রূপ পূর্বানুমান (অথবা জ্ঞানাকার) ব্যতিরেকে জগতের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে চেতনার স্বরূপ জানাই অবভাস-বিজ্ঞানের অভিপ্রায়। অবভাসবাদ বস্তুর যেসব গুণাবলির কথা বলে অবভাস-বিজ্ঞানের মতে সেগুলো হলো পূর্বানুমানসমূহ। কাজেই অবভাসবাদ ও অবভাস-বিজ্ঞানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যা হোক, হুসের্ল এদুটো বিষয়ের মধ্যে তিনটি প্রধান পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন ঃ

১. অবভাসবাদ অবভাসকে বাস্তবিক বা প্রকৃত (সত্তাসম্পন্ন) মনে করে, কিন্তু অবভাস-বিজ্ঞান অবভাস প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল অথবা অস্তিত্বশীল নয় — এরূপ প্রশ্নই তোলেনা।

২. অবভাসবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি অবভাসকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু অভবাস-বিজ্ঞান মনে করে যে অবভাস ব্যক্তির দ্বারা সক্রিয়ভাবে গঠিত হয়ে থাকে।

৩. অবভাস-বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবভাসবাদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অবভাস-বিজ্ঞানের ইতিহাস ঃ বিজ্ঞান

কোন বিজ্ঞানই শূণ্য থেকে উপজাত হতে পারে না। মানুষের চিন্তার ইতিহাসে দেখা গেছে যে কোন নতুন ভাবনাই হঠাৎ আবির্ভূত হয়নি। সুতরাং অবভাস-বিজ্ঞানেরও একটি ইতিহাস অবশ্যই থাকবে। অবভাস-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমির আলোচনার সুবিধার জন্য একে তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে। এই তিনটি ধারা হলো ঃ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতির ধারা, মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগতির ধারা, এবং দার্শনিক চিন্তার প্রগতির ধারা। এখানে মনে রাখতে হবে যে এই তিনটি ধারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবভাস-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেনি, বরং বলা যেতে পারে যে এই ত্রয়ীধারা অবভাস-বিজ্ঞানের মোহনায় এসে মিলিত হয়েছে।

যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অবভাস-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে, তা অবভাসবাদ মূলক। অবভাসবাদ ও অবভাস-বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অবভাসবাদ অবভাস-বিজ্ঞানকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। অবভাস-বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানসর্বস্ববাদের (psychologism) প্রতিবাদ স্বরূপ গড়ে উঠেছে বটে, তবে হুসের্ল অবভাসবাদের ক্রটির প্রতি দৃষ্টি রেখেও অবভাস-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে অবভাস-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবভাসবাদের যে অবদান ছিল তা ছিল নঞর্থক।

অবভাসবাদেরও একটি দীর্ঘ ইতিবৃত্ত আছে। প্যাট্রিসিয়াস (Patricius) একজন অবভাসবাদী ছিলেন। ১৫৯১-এ প্রকাশিত তাঁর পুস্তক *Paneosmia*-তে তিনি বলেছেন যে গ্রহগুলো প্রকৃতপক্ষে কী করছে এবং এগুলো কী করছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে — এদুয়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিকদের পার্থক্য করা সমীচীন হবে না। জর্জ বার্কলী-ও (Geroge Berkeley) বস্তুর প্রত্যক্ষণ এবং বস্তুর মধ্যে প্রভেদ দেখতে পাননি। কাজেই প্যাট্রিসিয়াস ও বার্কলির মধ্যে অবভাসবাদের আভাস দেখা যাচ্ছে। অক্সফোর্ডের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক স্যার বেঞ্জামিন ব্রুডি-ও (Sir Benjamin Brodie) অবভাসবাদের কাছাকাছি এসেছিলেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ঃ রাসায়নিক ঘটনা বা অবভাসের অর্থ কী? এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে রাসায়নিক ঘটনা কতকগুলো ক্রিয়া (operation) ভিন্ন আর কিছুই নয়। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া

বলতে বুঝতে হবে বিভিন্ন বস্তুর রসায়নের মধ্যে ওজনের পরিমানের পরিবর্তন, যে পরিবর্তন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে। অবভাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা যেতে পারে যে রাসায়নিক উপাদান বলতে বুঝতে হবে কেবলমাত্র ওজন যা দেশ (space) অধিকার করে আছে এবং যা সর্বপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও একই ওজন অব্যাহত রাখে।

স্যার জেম্‌স জীন্‌স (Sir James Jeans) তাঁর *The New Background of Science* নামক পুস্তকে বস্তুর (matter) প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সুপারিশ করেছেন। সামনের ঐ চেয়ার নামক বস্তুটি কী? তিনি বলেন যে যাকে আমরা বস্তু বলি সেগুলো বস্তু হিসেবে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সৃষ্টি করে না। চেয়ারটি স্বয়ং (বস্তু হিসেবে) আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের ওপর চিহ্ন (impression) এঁকে দিতে পারে না। চেয়ার নামক বস্তুটিতে যে বস্তুগত 'ঘটনা' ঘটে চলেছে সেই ঘটনাগুলোই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের ওপর চিহ্ন এঁকে দেয়। আমরা প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য দেখিনা, বরং সূর্যের মধ্যে যে বস্তুগত (রাসায়নিক) ঘটনাবলি ঘটে চলেছে, সেগুলো দেখে থাকি। অবিচ্ছিন্ন এই ঘটনাবলি সৃষ্টি করে আলো, আর এই আলোই আমরা দেখে থাকি সূর্যরূপে। তেমনিভাবে, আমরা চেয়ারটিকে দেখিনা। অন্ধকারে, চেয়ারটিতে ধাক্কা লাগলে আমরা চেয়ারটি অনুভব করি না, করি ঐ-চেয়ার এবং আমাদের দেহের সংঘর্ষ-জনিত শক্তির সঞ্চালন (transferance)। এমনিভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতির ফলে দ্রব্য, বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বের ধারনাগুলো অচল হয়ে পড়েছে। আর ফলস্বরূপ বস্তুর ধারনার মধ্যে বিষয়ীগত উপাদান ক্রমশঃ এসে পড়েছে। আইনস্টাইনের (Einstein) আপেক্ষিকতাবাদও (Thoery of relativity) এই মতবাদকে সমর্থন করেছে। আইনস্টাইন বলেছেন যে দেশের (space) ধারনা আমাদের কল্পনা মাত্র। বস্তু সমূহকে আমরা মনে মনে বিভিন্নভাবে সাজাই, আর এ-থেকেই আমাদের দেশের কল্পনা এসে থাকে। তেমনিভাবে কাল আমাদের আর একটি কল্পনা। ঘটনাসমূহ আমাদের কাছে যখন একটি একটি করে পর পর উপস্থিত হয়, তখন সেগুলোকে সাজাতে গিয়ে আমরা কাল কল্পনা করি। বই-এর লেখা আমরা সাধারণতঃ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পড়ি। তখন ডান দিকের লেখাগুলো পর পর আসে। কিন্তু যদি ডানদিক থেকে বাঁ দিকে পড়ি, তাহলে শব্দগুলোর ক্রম পাল্টে যায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে শব্দগুলোর মধ্যে প্রকৃত কোন ক্রম (sequence) নেই। আমাদের পড়ার ওপর নির্ভর করে কোন শব্দটি আগে আসবে এবং কোন শব্দটি পড়ে আসবে। কাজেই নিরপেক্ষ (absolute) কাল বলে কিছু নেই, কাল হলো আপেক্ষিক এবং কাল আমাদের পর্যবেক্ষণ পরম্পরার ওপর নির্ভর করে। এমনিভাবে নিউটন (Newton), দেকার্ত এবং কান্টের নিরপেক্ষতার বা পরমতার (absoluteness) ধারনা আধুনিক বিজ্ঞানে ভ্রান্ত প্রমাণিত

হলো। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ হাইজেনবার্গ (Heisenberg) কারন-কার্য-শৃঙ্খলাবাদকে (theory of causality) অস্বীকার করলেন এবং অনির্দ্দিষ্টবাদ (principle of indeterminacy) প্রতিষ্ঠিত করলেন। হাইজেনবার্গ বললেন ঃ "পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত বচনই পর্যবেক্ষণের দিক দিয়ে সাপেক্ষ"। আইনস্টাইনের আলোকপরিমানের (light quantum) ধারনা (যা নীল বোর-এর (Neil Bohr) দ্বারা সমর্থিত হয়েছে), ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক-এর (Max Planck) তাপ-পরিবহনতত্ত্ব (thoery of thermodynamics) ইত্যাদি জগৎ-সম্পর্কে সব রকম পরম বা সর্বব্যাপী (absolute) ধারনাকে এবং অপরিবর্তনশীলতাকে অস্বীকার করলো। এসব ঘটনাবলীর কাল থেকেই পদার্থবিদ্যায় বস্তু সম্পর্কে গতানুগতিক চিন্তাধারা বদলে যেতে লাগলো। পদার্থবিদ্যা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করলো। বলা হলো, দ্রব্য বা বস্তু আছে কি নেই এ-বিষয় আমরা নিশ্চিত নই; তবে দ্রব্য বা বস্তুর অবভাস আছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে পদার্থবিদ্যায় ভাববাদী চিন্তাধারার প্রবর্তন হলো। স্যার জেম্স জীন্স-এর বই *The New Background of Sciences* এবং জি.ডি. গরান-এর (G.D. Garan) বই *Our Science Ruled by Human Prejudices*-এ দক্ষতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে কী ভাবে আমাদের পুর্বানুমানগুলো আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করছে।

পদার্থবিজ্ঞানের এই উর্ব্বর ভাববাদী পরিমণ্ডলে অচিরেই হুসের্ল-এর ভাববাদী দর্শনের বীজের অঙ্কুরোদগম হলো। তবে পদার্থবিজ্ঞানের ভাববাদী চিন্তাধারা হুসের্ল-এর দর্শনে সরাসরি সমর্থন যোগায়নি। এরূপ সমর্থন এসেছে পরোক্ষভাবে। পদার্থবিজ্ঞানের নতুন চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্যার জেমস্ জীন্স বলেছেন ঃ "উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে পুরনো দর্শন অকেজো হয়ে পড়লো এবং বিংশ শতাব্দিতে পদার্থবিদ তাঁর নিজের জন্যে এক নতুন দর্শন রচনা করলেন। তাঁর এই নতুন দর্শনের সারসত্তা হলো এই যে তিনি আর পূর্বের মতো জগৎ-কে নিজের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে দেখলেন না। তিনি যা সৃষ্টি করেন, যা চয়ন করেন অথবা ধারনা করেন (abstracts), জগৎ কখনো কখনো তা-ই।" জেম্স জীন্স ১৯৩০ সালে এ-কথা লিখেছিলেন বটে, তবে আজও তাঁর অভিমত অভ্রান্ত বলে গ্রহন করা হচ্ছে। যা হোক, প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক এমনতর চিন্তা হুসের্ল-এর দর্শনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলো, সন্দেহ নেই। গণিতশাস্ত্রের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক হিসেবে তিনি (হুসের্ল) অবশ্যই প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এই গতি-পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

অবভাস-বিজ্ঞানের ইতিহাস ঃ মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানসর্বস্ববাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই যে মূলতঃ অবভাস-বিজ্ঞানের জন্ম, তা সর্বজনবিদিত। ইভ্‌রেট নাইট (Everett W. Knight) তাঁর *Literature Considered As Philosophy : The French Example* নামক পুস্তকে বলেছেন ঃ "এই (ঊনবিংশ) শতাব্দির শেষ পাদে আপেক্ষিকতাবাদ প্রান্তিক রূপ ধারন করে। এই হলো মনোবিজ্ঞানসর্বস্ববাদ, যার মতে সমস্ত বৌদ্ধিক প্রচেষ্টা যেহেতু মানসিক, সেহেতু এগুলো চরমভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এসব মনোবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। হুসের্ল-এর দার্শনিক জীবনের শুরুতে এরূপ চিন্তাধারা বৃহত্তর পরিমন্ডলে লক্ষ্য করা গেছে। আর এরূপ চিন্তাধারার প্রতিবাদেই অবভাস-বিজ্ঞান ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে।"

মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসেও অবভাস-বিজ্ঞানের এক সমৃদ্ধ পটভূমি রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে হুসের্ল তাঁর বই *Logische Untersüchungen* (১৯০০) মনোবৈজ্ঞানিক ষ্টুম্ফের নামে "সম্মান এবং বন্ধুত্বের প্রতীকস্বরূপ" উৎসর্গ করেছিলেন। অবভাস-বিজ্ঞানের জন্মভূমি জার্মানীতে দুটো গোষ্ঠীর মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। এক গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন ফেক্‌নার (Fechner), হেম্‌হজ (Helmholtz), হবুন্ড (Wundt), ম্যুলার (Müller) প্রমুখ মনোবিদ, এবং অপর গোষ্ঠীতে ছিলেন হেরিং (Hering), ব্রেন্টানো (Brentano), ম্যাক (Mach) ও ষ্টুম্ফ-এর মতো মনোবৈজ্ঞানিকগণ। উইলিয়ম জেম্‌স-এর ভাষায় প্রথম গোষ্ঠীকে কঠোর মানসিকতা সম্পন্ন (tough-minded) এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে কোমল মানসিকতাসম্পন্ন (tender-minded) বলা যেতে পারে। প্রথম গোষ্ঠী কঠোর পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিল, আর দ্বিতীয় গোষ্ঠী অবভাসমূলক বর্ণনা এবং জন্মগত প্রত্যক্ষবাদে (nativism) আস্থাশীল ছিল। দ্বিতীয় গোষ্ঠী পরীক্ষণের চেয়ে তার্কিক পদ্ধতি বা তর্ক-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলো। ষ্টুফ প্রথম জীবনে কঠোর পরীক্ষণপদ্ধতিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু জার্মানীর প্রুশিয়া নামক অঞ্চলে থাকার সময় ব্রেন্টানোর প্রভাবে কোমল-মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। হুসের্ল ব্রেন্টানো ও ষ্টুম্ফ উভয়েরই ছাত্র ছিলেন এবং এঁদের প্রভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন।

ষ্টুম্ফ তাৎক্ষণিক জ্ঞেয়-বস্তুর (immediately given) অভিজ্ঞতাগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

১. অবভাসিক অভিজ্ঞতা, যেমন বর্ণালীর বা সুরের কিংবা চিত্রকলার কাল্পনিক উপাত্ত। এগুলো অবভাস বিজ্ঞানের অনুধ্যেয়।

২. প্রত্যক্ষণ, কলন (grouping), ধারনা-করন, আকাঙ্খা করন, ইচ্ছা করন ইত্যাদি মানসিক ত্রিয়াসমূহ যা ব্রেন্টানোর মানসিক ক্রিয়াসমূহের সমতুল্য।

৩. জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধাবলি। এগুলো আমরা অভিজ্ঞতায় তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে থাকি; অথচ এগুলো অনুভূতি নয়।

ষ্টুম্ফ অবভাস ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন, এদুটো পরস্পর স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত হতে পারে ঃ যেমন, মানসিক ক্রিয়ার পরিবর্তন হলো অথচ অবভাসের পরিবর্তন হলো না, অথবা অবভাসের পরিবর্তন হলো, কিন্তু মানসিক ক্রিয়ার পরিবর্তন হলো না। হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানে ষ্টুম্ফেব অবদান থাকলেও হুসের্ল ও ষ্টুম্ফের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ষ্টুম্ফ অবভাস-বিজ্ঞানকে প্রকৃত-বিজ্ঞান না ভেবে প্রাক্-বিজ্ঞান বা দিক্-দর্শী-বিজ্ঞান (propaedeutic science) মনে করতেন। কিন্তু হুসের্ল প্রথম থেকেই অবভাস-বিজ্ঞানকে নিরীক্ষণের (immanent inspection) মাধ্যমে শুদ্ধ-সত্তার বর্ণনামূলক বিজ্ঞান মনে করতেন। তাছাড়া, স্টুম্ফ মূলতঃ একজন মনোবিজ্ঞানী ছিলেন আর হুসের্ল ছিলেন প্রধানতঃ একজন দার্শনিক।

অবভাস-বিজ্ঞানের সূত্র শরীরবিদ পার্কিঞ্জী (Perkinji) (১৭৮৭-১৮৬৯) এবং এমনকি জার্মান দার্শনিক-কবি গ্যাঠের (Goethe ঃ ১৭৪৯-১৮৩২) মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। গ্যাঠে ছিলেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণের একাগ্র সমর্থক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অবভাস-বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কাজেই গ্যাঠের প্রভাব অবভাস-বিজ্ঞানে থাকা স্বাভাবিক। অবভাস-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে গ্যাঠে তাঁর বর্ণ-তত্ত্ব (theory of colours) উপস্থাপিত করেন (পরবর্তী কালে অবশ্য এই বর্ণ-তত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়)। বর্ণ-তত্ত্বের অবভাসিক পদ্ধতিতে পার্কিঞ্জীও আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত শরীরবিদ পার্কিঞ্জী ১৮২৪ সাল থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে চাক্ষুষ অবভাস-তত্ত্বের (visual phenomenology) ওপর দুখন্ডের একখানি পুস্তক রচনা করেন। আশ্চর্য্যের কথা, এই পুস্তক তিনি গ্যাঠেকে উৎসর্গ করেন। পার্কিঞ্জী দেখালেন, দুটো বর্ণের কোনটি অপরটির চেয়ে কম অথবা বেশী উজ্জ্বল নয়। উজ্জ্বলতা নির্ভর করে আলোর ওপর। একটি কক্ষে লাল ও নীল বর্ণ রাখা হলো। অধিকতর আলোতে লালকে উজ্জ্বলতর মনে হবে, কিন্তু আলোর পরিমাণ ধীরে ধীরে কমালে একসময় লালের চেয়ে নীল বর্ণকেই অধিকতর উজ্জ্বল মনে হবে। বর্ণের এই বৈশিষ্টকে পার্কিঞ্জী-অবভাস (Perkinji effect) বলে। পার্কিঞ্জী অবভাস-বিজ্ঞানকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে। তবে অবভাস-বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে গ্যাঠে ও পার্কিঞ্জীর অবদান থাকলেও এই অবদান কেবলমাত্র

দিক্-নির্দেশক ছিল। যা হোক, অবভাস-বিজ্ঞানের প্রস্তুতি-পর্বে যেসব মনোবিজ্ঞানীর অবদান অধিক ছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইউয়াল্ড হেরিং (Ewald Hering)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অনুভূতি চেতনায় অবস্থান করে এবং তাই মানসিক ঘটনাকে বুঝতে হলে চেতনার বর্ননার প্রয়োজন। পদার্থবিদ ফেক্‌নার-এর (Fechner) ছাত্র হলেও তিনি কবি গ্যাটের 'প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ' পদ্ধতিই ('method of trained observation') অনুসরন করেছেন। হুসের্ল হেরিং-এর পদ্ধতি ও মতবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

অবভাস-বিজ্ঞানের ইতিহাস ঃ দর্শন

অবভাস-বিজ্ঞান উর্বর দার্শনিক ভূমিতে অঙ্কুরিত হয়েছিল। হুসের্ল 'phenomenology' শব্দটি ('আভাস বিজ্ঞান') গ্রীক শব্দ 'phainomenon' থেকে পেয়েছিলেন। 'phainomenon' শব্দটির অর্থ হলো 'অবভাস'। তবে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ এই শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, হুসের্ল সে অর্থে একে ব্যবহার করেননি। তৎসত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে এই শব্দটি যেসব গ্রীক দার্শনিক ব্যবহার করেছিলেন সেসব দার্শনিকগণের দ্বারাও হুসের্ল অন্ততঃ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাইরোর (Pyrrho ঃ আনুমানিক ৩৬০ থেকে ২৭০ খৃষ্টপূর্ব) কথা বলা যেতে পারে। পাইরো-এর ছাত্র টিমন (Timon) বলেছেন যে পাইরো বলতেন যে আমরা প্রকৃতি বা পরমসত্তা (reality) সম্বন্ধে কখনোই নিশ্চিত হতে পারি না। কারণ, পরমসত্তা আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে কখনোই আমরা জানতে পারবো না। কাজেই আমাদের প্রত্যক্ষ আর পরমসত্তা এক বিষয় নয়। এখানে বলা যেতে পারে যে অনেকের ধারনা গ্রীক বীর আলেকজ্যাণ্ডারের সঙ্গে এসে, পাইরো জৈনদর্শনের সপ্তভঙ্গী-ন্যায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এরূপ কথা বলেছেন। ভিক্ষু নানাজীবকো এরূপ অভিমত সমর্থন করেছেন। যা হোক, হুসের্ল-এর বন্ধনীকরন পদ্ধতির (epoché) সঙ্গেও পাইরো-এর বন্ধনীকরন পদ্ধতির আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে। পাইরো বলেছিলেন যে যেহেতু কোন বিষয় সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না, সেহেতু আমাদের বচনগুলোকে স্থগিত (suspend) রাখতে হবে — আমাদের কোন কথাই বলা উচিৎ হবে না (aphasia)। আর কোন কিছুই যদি নিশ্চিতভাবে জানতে না পারি, তবে আমাদের কোন কিছুই করা উচিৎ নয় (ataxia)।

এরপর সন্যাসী অগাষ্টাইন-এর (St. Augustine) (৩৫৪-৪৩০) দর্শনে অবভাস-বিজ্ঞানের কিছু কিছু লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। আলেকজ্যান্ডার ও সেলেস্‌নিক (Alexander and Selesnick) তাঁদের *The History of Psychiatry* নামক পুস্তকে সন্যাসী অগাষ্টাইনকে হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানের পূর্বসূরী বলেছেন। ফুলার ও

ম্যাক্‌মুরিন (Fuller and McMurrin) তাঁদের বই *The History of Philosophy*-এ বলেছেন যে ব্রেন্টানো-এর মন-বিষয়ক চিন্তাধারায় এ্যারিষ্টটল (Aristotle)-এর দর্শন, মধ্যযুগীয় দর্শন এবং দেকার্ত-এর দর্শনের প্রভাব রয়েছে। তবে এটা আমরা নিশ্চিত জানি যে অবভাস-বিজ্ঞানের 'অভিপ্রেত' (intentionality) পদটি মধ্যযুগীয় দর্শনের 'intentio' পদটি থেকে এসেছে। Intentio পদটির অর্থ হলো 'চেতনায় বস্তুর অবস্থিতি'। এমনিভাবে মধ্যযুগীয় দর্শনের দ্বারাও হুসের্ল-এর চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়েছে।

তবে হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানের মূল উৎস হলো ব্রেন্টানো-এর দর্শন তথা তৎকালিন দার্শনিক চিন্তাধারার পরিবলয়। ব্রেন্টানো আবার ভাববাদী দার্শনিক ট্রেন্ডলেনবুর্গ-এর (Trendelenburg) (১৮০২-১৮৭২) দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছিলেন। ট্রেন্ডেলনবুর্গ হেগেল-এর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে পরমতত্ত্ব হলো গতি বা বেগ (motion)। এই বেগ যান্ত্রিক (mechanical) নয়। এর উদ্দেশ্য আছে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পথ সেই পথেই জগতের সৃষ্টি ও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বুদ্ধি ও এষণা (will) না থাকলে উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। কাজেই পরমতত্ত্বে বুদ্ধি ও এষণার উপস্থিতি মেনে নিতেই হবে। কিন্তু জ্ঞানকারগুলোতে পরমসত্তার এই বুদ্ধি ও এষণা ধরা পড়ে না। এ-কথা বলার জন্যই ট্রেন্ডেলেনবুর্গ-কে মরমী (mystic) দার্শনিক বলা হয়। ট্রেন্ডেলেনবুর্গ-এর ছাত্র ব্রেন্টানের বুর্জবুর্গ (Wursburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ব্রেন্টানো চিন্তাধারাকে ট্রেন্ডেলেনবুর্গ যেমন প্রভাবিত করেছিলেন, তেমনি খানিকটা প্রভাবিত করেছিলেন দার্শনিক বার্নার্ড বোল্‌জানো (Bernard Bolzano : ১৭৮১-১৮৪৮)। বোলজানো চিন্তাকার (চেতনা) ও চিন্তার (চেতনার আধেয়) মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। যা হোক, ব্রেন্টানো-এর স্বল্প পরিমান লেখার মধ্যে *Psychology vom empirischen standpunkte* নামক পুস্তকখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে অবভাসে অনুবর্তী জ্ঞেয়ত্ব (immanent objectivity) থাকে, যদি অবভাস আধেয়-এর প্রতি (toward content) নির্দেশিত হয়। চেতনা বস্তুর প্রতি ধাবিত হলে অবভাসে বস্তু অভিপ্রেত হিসেবে উপস্থিত থাকে। ব্রেন্টানো-এর এ-কথা বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে মানসিক ঘটনা প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার ক্রিয়া। যেমন, আমরা যখন কোন বর্ণ প্রত্যক্ষ করি, তখন বর্ণটি অবশ্যই কোন মানসিক ক্রিয়া নয় — বর্ণটি হলো জ্ঞেয় বস্তু বা আধেয়। কিন্তু এই আধেয় প্রত্যক্ষণ-ক্রিয়ার মধ্যেই অবস্থিত। অর্থাৎ ক্রিয়াশীল চেতনায় বর্ণটির আভ্যন্তরিন অস্তিত্ব (inexistence) রয়েছে। সুতরাং মানসিক ক্রিয়া আত্মস্থ বা শূণ্য নয় (not self-contained)। এর মধ্যে জ্ঞেয় বস্তু বা আধেয় অভিপ্রেত

হিসেবে রয়েছে, অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে অনুবর্তী জ্ঞেয়ত্ব আছে। মানসিক ক্রিয়া অথবা চেতনার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে বস্তু আত্মস্থ, এর বাইরের কোন বিষয়ের প্রতি বস্তু ধাবিত হয় না। একখন্ড পাথর রাস্তার ধারে পড়ে আছে। পাশদিয়ে অনেক মানুষ যাতায়াত করছে। পাথরের টুকরোটি কোন মানুষের বিষয়ই আগ্রহী নয়। শুধু তা-ই নয়, এটি অব্যবহিত পরের বা পাশের বস্তুটির প্রতিও আগ্রহী নয়। তাই বলা হচ্ছে যে বস্তু আত্মস্থ (self-contained)। কিন্তু চেতনা এমন বিষয় নয়। চেতনা সর্বদাই কোন না কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। আমরা যতক্ষণ চেতন থাকি, ততক্ষণই কোন না কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকি। এমন হতেই পারের না যে আমরা চেতন আছি, অথচ কোন বস্তু বা বিষয় (ধারনা বা ভাব) সম্পর্কে চেতন নই। চেতনার সঙ্গে বস্তুর এখানেই মূল পার্থক্য। তাই মনোবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে মূলগত (intrinsie) স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুতে (চেতনায়) এই স্বয়ং সম্পূর্ণতা নেই, কারণ চেতনা সর্বদা জ্ঞেয়-বস্তুর প্রতি ধাবিত হচ্ছে এবং জ্ঞেয়-বস্তু ভিন্ন চেতনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। চেতনা বস্তু অভিমুখী। এই অভিপ্রেত ছাড়া চেতনা নিরর্থক। ব্রেন্টানো-এর এই আপতিক সরল বক্তব্য দর্শনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। ব্রেন্টানো-এর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব গণিতবিদ হুসের্ল ও চিকিৎসাবিদ-মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Frend)-কে ভীষনভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর হুর্সেল-এর ক্ষেত্রে এর সঙ্গে ছিল ব্রেন্টানো-এর অভিপ্রেত-সম্পর্কীয় তত্ত্বের প্রভাব।

অবভাস-বিজ্ঞানের পটভূমিতে আরও একটি প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। এই প্রভাব ছিল ব্রেন্টানো-এর ছাত্র অষ্ট্রিয়ার এ্যালেক্সিয়াস মাইনং-এর (Alexius Meinong) (১৮৫৩-১৯২০)। ভিয়েনাতে মাইনং ব্রেন্টানো-এর অধীনে শিক্ষার্থী ছিলেন। মাইনং-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে তিনিই সর্বপ্রথম সত্তা (being অথবা *sein*) এবং চরিত্র-এর (Character অথবা *sösein*) মধ্যে পার্থক্য রচনা করেন। যেমন, তাঁর মতে 'সোনার পাহাড়' অথবা 'বৃত্তাকারে চতুষ্কোণ' জ্ঞেয় (object) অর্থাৎ এদের চরিত্র আছে, যদিও এগুলোর সত্তা নেই। কারণ, এগুলোর গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য আছে আর এই গুণাবলি আমাদের চিন্তার ওপর নির্ভর করে না। মাইনং তাঁর মতবাদকে 'জ্ঞেয়-মতবাদ' বা *Gegenstandtheorie* বলেছেন। তিনি বলেছেন, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বস্তুই জ্ঞেয় হবে এমন নয়; এমনকি প্লেটোর কল্পগুলোও (ideas) জ্ঞেয় হতে পারে। প্লেটোর এমনসব কল্পগুলো হচ্ছে গাণিতিক বিষয় (entities); নীলতত্ব, ভালোত্ব, ইত্যাদি; যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত বচনগুলো; এবং

চতুষ্কান, বৃত্ত ইত্যাদি ধারনাসমূহ। মোট কথা, যেসব বিষয় সম্পর্কে আমরা ভাবতে পারি অথবা যেসব বিষয় সম্পর্কে আমরা বচন তৈরী করতে পারি সেসব বিষয়ই আমাদের চিন্তা বা আলোচনার ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ এসববিষয় জ্ঞেয় বিষয়রূপে স্বাধীনভাবে রয়েছে। প্রাকৃতিক বস্তু থেকে এসব জ্ঞেয় বিষয়কে পৃথক করার জন্য মাইনং দুটো পদ ব্যবহার করেছেন —অবস্থান বা অস্তিত্ব (existence) এবং অনুঅবস্থান (subsistence)। প্রাকৃতিক বস্তু সমুদয় অবস্থান করে বা অস্তিত্বশীল, আর অপরাপর জ্ঞেয় বিষয়সমূহ অনুঅবস্থান করে। এই অপরাপর বিষয়গুলোকে আমরা যুক্তিবিজ্ঞানের সারসত্তাসমূহ বলতে পারি। তথাপি এক অর্থে এগুলোর অস্তিত্ব বা অবস্থান আছে এবং সত্তা আছে, কারণ আমরা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'চারকোণযুক্ত বৃত্ত' কথাটি সম্পর্কে আমরা অবশ্যই আলোচনা করতে পারি। মাইনং-এর মতে চেতনা না থাকলেও এগুলো থাকবে। চেতনা যদি পৃথিবী থেকে চলেও যায়, তবু, প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মতো এগুলোর সারসত্তা-ও পৃথিবীতে থাকবে। আবার তেমনিভাবে, চেতনা না থাকলেও কিছু বচন যেমন যথার্থ থাকবে, তেমনি অন্য আর কিছু বচন অযথার্থ থাকবে। পরে নতুন কোন চেতনা এলে তা বুঝতে পারবে কোন্ বচনটি যথার্থ আর কোন্‌টি অযথার্থ এবং কোন্‌টি স্ববিরোধী।

এসব দার্শনিকদের প্রভাব ছাড়াও হুসের্ল-এর ওপর আরও কয়েকজন আধুনিক দার্শনিকদের প্রভাব ছিল। এঁদের মধ্যে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), হিউম (১৭১১-১৭৭৬), কান্ট (১৭২৪-১৮০৫),. হেগেল (১৭৮১-১৮৪৮) ও লোৎসের (Lotze : ১৮১৭-১৮৮১) নাম উল্লেখযোগ্য। দেকার্ত তাঁর *Meditations* নামক গ্রন্থে আত্মাকে সন্দেহাতীত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে আত্মা থেকেই দার্শনিক চিন্তা শুরু করতে হবে। কিন্তু হুসের্ল বললেন যে দেকার্ত-এর এই আত্মা ব্যবহারিক (empirical) আত্মা, অতিবর্তী জ্ঞাতা (transcendental subjectivity) নয়। তথাপি, দেকার্ত-এর আত্মা বিশ্লেষণ হুসের্ল-কে প্রভাবিত করেছিল। হিউম ও কান্ট-এর প্রভাবও হুসের্ল-এর ওপর কম ছিল না। হুসের্ল বলেছেন যে হিউম বাস্তব জগৎ-কে কল্পনার রাজ্যে পরিণত করেছেন। বাস্তব জগৎ বলে কিছু নেই, যা আছে তা কেবল বিচ্ছিন্ন অনুভূতি সমূহ। কাজেই হিউম বস্তুময় জগতের ধারনার মূলে কুঠারাকাত করেছেন। হিউম-এর এরূপ ব্যাখ্যা বাস্তবতার আত্মকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। কান্ট হিউম-এর চিন্তাধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি বলেন যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তব উপাত্তের (data) যেমন প্রয়োজন, মানসিক ক্রিয়ারও তেমনি। মন জ্ঞানাকারগুলোর সাহায্যে বাস্তব উপাত্ত বা অনুভূতিগুলোকে সুসংহত করে, তবেই জ্ঞান হয়। আবার

এই জ্ঞানাকারগুলো যুক্তির আদর্শ (ideas of reason) থেকে অনুসৃত। কাজেই কান্ট-এর অনুধ্যানও হুসের্ল-এর অতিবর্তী জ্ঞাতার পথ-নির্দেশ দিয়েছে।

হুসের্ল-এর ওপর এরপর আসে হেগেল-এর প্রভাব। হেগেল কান্ট-এর সন্দেহবাদকে (scepticism) অগ্রাহ্য করেছেন। কান্ট-এর মতে অনুভূতি সমূহ (sensibilities) যখন দেশকালের আকার এবং জ্ঞানাকারগুলোর সাহায্যে সুসংহত করা হয়, তখনই তা জ্ঞানে পরিণত হয়। কাজেই দেশ-কাল ও জ্ঞানাকারের পরিমন্ডলেই শুধুমাত্র আমরা বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারি। এর অর্থ হলো এই যে বস্তুকে অবিকৃত বিষয় রূপে (things-in-themselves) আমরা কখনোই জানতে পারি না। হেগেল এরূপ দার্শনিক তত্ত্বের পরিপন্থী ছিলেন। কান্ট-এর সন্দেহবাদকে অতিক্রম করে পরমসত্তাকে পরমসত্তারূপে (দেশ-কাল ও জ্ঞানাকারগুলোর দ্বারা বিকৃত অবস্থায় নয়) জানাতেই ছিল তাঁর আগ্রহ। তাঁর মতে বিজ্ঞান পূর্ব থেকে মেনে নেয়া কতকগুলো ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে সত্তাকে জানতে চেষ্টা করে না। বিজ্ঞানের লক্ষ্য হবে বস্তুর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনামূলক পরীক্ষণের মাধ্যমে পরমসত্তাকে জানা। আর এরূপ পদ্ধতি থেকেই এই জ্ঞানের যাথার্থ্য পাওয়া যাবে। বলতে গেলে 'অবভাস-বিজ্ঞান' কথাটিকে হেগেল এরূপ অনুসন্ধানের অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

হেগেল ধারনা ও বস্তু বা জ্ঞেয়-এর মধ্যে সংযোগ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সংযোগ বের করতে পারলেই কান্ট-এর দর্শনে জ্ঞান ও জ্ঞেয়-এর মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে তা দূরীভূত হবে। জ্ঞানাকারগুলো কেবল আমাদের কাছেই যথার্থ এবং বস্তু তার নিজের মধ্যে রয়েছে যেখানে জ্ঞানাকারগুলো নেই — এই হলো কান্টের অভিমত। পক্ষান্তরে, হেগেল বলেছেন যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হেগেলের এরূপ মন্তব্য হুসের্ল-কে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তি অধ্যায়ে আমরা দেখবো কেমন করে হুসের্ল এরূপ ভাববাদী দর্শনের পটভূমিতে তাঁর অবভাস বিজ্ঞানের ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হুসের্ল ও অবভাস-বিজ্ঞান

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে দেকার্ত যেমন এক সন্ধিক্ষণের ব্যক্তিত্ব, হুসের্লও তেমনি। মধ্যযুগীয় দর্শনের সারশূণ্যতা দেখে দেকার্ত ব্যথিত হয়েছিলেন ঃ ধর্ম বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর দর্শন যদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, দর্শনের পথ-প্রদর্শক হবে যুক্তি, বিশ্বাস নয়। ধর্মের গৃহীত (received) বচন থেকে দর্শনের যাত্রা শুরু হবে না, শুরু হবে সন্দেহাতীত বচন থেকে। এই বচন তিনি পেয়েছিলেন সন্দেহ-করণ পদ্ধতির মাধ্যমে আর তাঁর সন্দেহাতীত বচন হলো ঃ "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি।" দেকার্ত চেয়েছিলেন, দর্শনের ভিত্তি হবে মজবুত, সন্দেহাতীত, অবিসংবাদিত। তিনি বললেন, আমার অস্তিত্ব বা আমি-ই সেই সন্দেহাতীত অবিসংবাদিত সত্য। দেকার্ত-এর মতে জ্ঞাতার আত্মা হলো দার্শনিক চিন্তার অভ্রান্ত সূচনা। হুসের্ল দেকার্ত-এর কথা মেনে নিয়ে দার্শনিক আলোচনা শুরু করেননি। এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। হুসের্ল বললেন, দেকার্ত-এর আত্মা ব্যবহারিক বা অভিজ্ঞতা-জাত। এই আত্মা বিশুদ্ধ নয়। এই আত্মায় রয়েছে চিন্তা এবং চিন্তার বিষয়। তাছাড়া, এই আত্মার ধারনা হয়েছে বাইরের অভিজ্ঞতা থেকে। লোকে বলে আমার একটি আত্মা আছে (অথবা ব্যক্তিত্ব আছে), তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমার সত্যি একটি আত্মা আছে। কাজেই আত্মার ধারণা একটি পূর্বানুমান। কিন্তু দর্শনকে সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি করতে হলে তাকে বিশুদ্ধ আত্মা থেকে শুরু করতে হবে। অনাত্মা (non-ego) বা বহির্জগতের যাথার্থ্য আসবে আত্মা থেকেই। টেবিলের ওপর কলমদানি রয়েছে, আমার আত্মাই এর সাক্ষ্য এবং এর যাথার্থ্য আমার আত্মাই আমাকে বলে দিচ্ছে। শুধু-তা-ই নয়, বিশুদ্ধ আত্মাই অভিজ্ঞতা (অবভাস) তৈরী করে চলেছে। আত্মা সম্পর্কে আমাদের যে ধারনা আছে তাতে পূর্বানুমান (presupposition) রয়েছে — এ আমরা দেখেছি। তেমনি ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতাতেও রয়েছে পূর্বানুমান। এই পূর্বানুমানগুলোকে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আত্মা অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে অজ্ঞিতার মুখোমুখী হতে পারবে। কারণ, এই পূর্বানুমানগুলো আত্মা বা অভিজ্ঞতাকে আবৃত করে আছে। হুসের্ল-এর এই অভিমত দর্শনের ইতিহাসের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

এডমুন্ড গুস্টাফ হুসের্ল (Edmund Gustav Husserl) ঃ ১৮৫৯-১৯৩৮) জার্মানীর প্রসনিৎস (Prossnitz) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি হালে (Halle), গ্যটিন্‌জেন্ (Götingen) এবং ফ্রাইবুর্গ (Freiburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অধ্যাপনা

করেন। সংখ্যাতত্ত্বের ওপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি ডক্‌রেট উপাধি লাভ করেন। বার্ট্রান্ড রাসেলের (Bertrand Russell) মতোই হুসের্ল-এর দর্শনে উৎসাহ এসেছিল গণিত-শাস্ত্র তথা যুক্তিবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে। গণিতশাস্ত্রের ভিত্তিভূমিত্তর জন্যই হুসের্ল দেকার্ত-এর দর্শন-চিন্তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সমর্থন করেছিলেন। দেকার্ত-ও গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি দর্শনকে গণিতশাস্ত্রের মতোই এক সন্দেহাতীত বিষয়রূপে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। হুসের্ল-এর দর্শনে তাই দেকার্ত-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হুর্সেল-এর প্রধান প্রধান রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ *Philosophy of Arithmetic* (১৮৯১), *Logical Investigations* (১৯০০ ঃদু'খন্ডে প্রকাশিত), *Ideas on a Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy* (১৯১৩), *Lectures on the Phenomenology of the Inner Time Consciousness* (১৯২৮), *Formal and Transcendental Logic* (১৯২৯), *Cartesian Meditations* (১৯৩১), *The Crisis of European Science and Transcendental Phenomenology* (১৯৩৬), এবং *Experience and Judgment* (১৯৩৯ ঃ মৃত্যুর পর প্রকাশিত।

হুসের্ল দর্শনকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এযাবৎ দর্শনের ভিত্তি শক্ত অর্থাৎ সন্দেহাতীত ছিল না বলেই দর্শনের ইতিহাসে যথার্থ প্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। দর্শনের ইতিহাসে কেবল পরস্পর-বিরোধী মতবাদ দেখা যায়। এর কারণ এই যে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। হুসের্ল তাই দর্শনকে একটি কঠোর বিজ্ঞানে (rigorous science) পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর *Philosophie als strenge Wissenschaft* নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে দর্শনকে এক সন্দেহাতীত নীতির ওপর দাঁড় করাতে হবে। তাহলেই দর্শন সামান্যভাবে যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত (universally valid and evident) হবে। ১৮৯১-এ প্রকাশিত *Philosophy of Arithmetic* নামক পুস্তকে হুসের্ল সংখ্যা (number) সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সংখ্যা বস্তু-জগতে নেই, আবার অবভাসেও নেই। সংখ্যা রয়েছে ধারনায়, আর এই ধারনা চেতনার দ্বারা সৃষ্ট। অথচ সংখ্যা বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে। কাজেই সংখ্যাই হলো বস্তুর বা বিষয়ের সারসত্তার অন্তর্গত। সংখ্যাকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করি, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বস্তু বা বিষয়ের সারসত্তা সজ্ঞার (intuition) সাহায্যে জানা যেতে পারে। এই পুস্তকে অবভাস-বিজ্ঞানের আভাস পাওয়া গেলেও অবভাস-বিজ্ঞানের রূপরেখা এতে দেখা যায় না। *Philosophy*

of Arithmeti-এর সমালোচনা করেন গণিতবিদ গট্‌লব ফ্রেগ (Gottlob Frege)। হুসের্ল এই সমালোচনা স্বীকার করে নেন এবং ন বছর পর অর্থাৎ ১৯০০-এ দুখন্ডে তাঁর বই *Logical Investigations* প্রকাশ করেন। এই পুস্তকেই অবভাস-বিজ্ঞানের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। এতে হুসের্ল অবভাস-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি এখানে অবভাস-বিজ্ঞানকে একটি অভিজ্ঞতা-বিহীন (non-empirical) বিজ্ঞান বলেছেন। 'অভিজ্ঞতা-বিহীন' শব্দটির সাহায্যে এই বোঝানো হয়েছে যে বাস্তব বিষয়ের বা বস্তুর অভিজ্ঞতার স্থান অবভাস-বিজ্ঞানে থাকবে না। বস্তু আছে কি নেই, তা দেখবার প্রয়োজন নেই। বিষয়ী যে অবভাস দেখতে পাচ্ছে, তা-ই হবে অনুসন্ধানের বিষয়। অবভাস-বিজ্ঞানের লক্ষ্য হবে এই অবভাস প্রত্যক্ষ করার সময় বিষয়ীর আত্মগত প্রক্রিয়ার বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণ।

হুসের্ল এখানে অবভাস-বিজ্ঞানকে একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলেছেন এজন্য যে এখানে বিষয়ীকে বিষয় থেকে পৃথক করা হয়। তাছাড়া, অবভাস-বিজ্ঞানে বিষয়ীগত অবভাসের উৎস এবং বিষয়ীগত অবভাসের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ককেও দূরে রাখা হয়। *Logische Untersuchungen* বা *Logical Investigations*-এর প্রথম খন্ডে হুসের্ল *Prolegomena zur reinen Logik*-এই শিরোনামে প্রকাশ করেছিলেন। এখানে তিনি বিশুদ্ধ যুক্তি-বিজ্ঞানের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যুক্তির আকারের স্বরূপ জানা। তিনি দেখিয়েছেন যে যুক্তি-বিজ্ঞান বস্তু তথা বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং একটি স্বাধীন অধ্যয়ন (study)। *Logical Investigations*-এর দ্বিতীয় খন্ডে (বিশেষ করে দ্বিতীয় সংস্করনে) হুসের্ল ঐ পুস্তকের প্রথম খন্ডে উল্লিখিত পদ্ধতি আধিবিদ্যক সমস্যাবলীতে প্রয়োগ করেছেন। এই দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশনার মধ্যবর্তী সময়েই অবভাস-বিজ্ঞান কথাটির পূর্ণ অর্থ হুসের্ল আবিষ্কার করেন। প্রথম প্রকাশনায় তিনি বলেছিলেন যে অবভাস-বিজ্ঞান হলো বিষয়ীগত-পদ্ধতির বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা। এ-অর্থে মনোবিজ্ঞান থেকে অবভাস-বিজ্ঞানের পার্থক্য ছিল অল্প। দ্বিতীয় প্রকাশনায় হুসের্ল 'অবভাস-বিজ্ঞান' শব্দটির অর্থই পাল্টে দেন। এবার তিনি অবভাস-বিজ্ঞানকে কল্পবিজ্ঞান (eidetic science) অর্থে ব্যবহার করেন। কল্প-বিজ্ঞান অর্থে বুঝতে হবে কল্প (eidos) সম্পর্কে যুক্তি-সম্মত অনুসন্ধান। মানসিক কল্পের সাহায্যে বস্তু-সম্পর্কে আমার একটি ধারনা অবশ্যই আছে। এখন আমি জানতে চাইছি ফুল সম্পর্কে আমার ধারণারটির সারসত্তা কী? হুসের্ল বলেছেন, ধারনার সারসত্তা জানতে হলে কল্পনায় ধারনাটিকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত করতে হবে। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে থেকে ধারনাটির সারসত্তা বোঝা যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি ভাবলাম যে ফুলটির পাপড়িগুলো এক এক করে ঝড়ে পড়ছে। তখন দেখা যাবে

যে একসময় মনে হবে যে ওটি আর ফুল থাকছে না। এমনিভাবে ফুলটির বিভিন্ন বিষয় বা অংশ কল্পনার সাহায্যে পরিবর্তন করতে থাকলে দেখা যাবে যে একসময় ওটি আর ফুল থাকছে না। এভাবে ফুলের ধারনার সারসত্তা জানা যাবে। কাজেই কল্পবিজ্ঞানের কাজ হবে বস্তু-প্রত্যক্ষের সময় মানসিক প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ভাবগত সম্ভাবনার বিশ্লেষণ। যা হোক, *Logical Investigations*-এর প্রথম প্রকাশনায় হুসের্ল যুক্তি-বিজ্ঞানকে যে উন্নত আসন দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় প্রকাশনায় তিনি সেই উন্নত আসন অবভাস-বিজ্ঞানকেও দিলেন।

ঠিক এই সময় হুর্সেল মনোবিজ্ঞান সর্বস্ববাদ (psychologism) এবং প্রাকৃতবাদের (naturalism) বিরুদ্ধে যুক্তিজাল, বিস্তার করেন। মনোবিজ্ঞানসর্বস্ববাদের মতে মনোবিজ্ঞানই হলো দর্শনের ভিত্তি-ভূমি এবং অন্তর্দর্শন হলো দর্শনের মুখ্য পদ্ধতি। এরূপ কথা উনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগেই জার্মান দার্শনিক ফ্রাইস (Fries) ও বেনেকে (Beneke) বলেছিলেন। এঁদের মতে যুক্তিবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো মনোবিজ্ঞান সম্মত বলেই যথার্থ, আর যুক্তিবিজ্ঞানের পদ্ধতি হলো অন্তর্দর্শনমূলক। জন স্টুয়ার্ট মিল-ও (John Stuart Mill) তাঁর *System of Logic*-এ একই বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছিলেন যে গণিতশাস্ত্র ও যুক্তিবিজ্ঞানের নীতিগুলো অন্তদর্শনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। হুসের্ল এর প্রতিবাদ করে বলেন যে যুক্তি-বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের নীতিগুলো অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে পাওয়া যায়না, পাওয়া যায় স্বজ্ঞার (intuition) মাধ্যমে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উত্তরকালে ফ্রেগে এবং কার্নাপ-ও (Carnap) মনোবিজ্ঞানসর্বস্ববাদের বিরোধী ছিলেন। প্রাকৃতবাদের বিরোধীতাও করেছিলেন হুসের্ল। প্রাকৃতবাদ অনুসারে সমস্তরকম বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হতে পারে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু, এবং প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কাজেই প্রাকৃতিক বিষয়ের বাইরে কোন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা অধ্যয়ন হতে পারে না।

পূর্বেই দেখা গেছে যে হুসের্ল-এর দার্শনিক চিন্তার শুরু হয়েছিল ব্রেন্টানো-এর অভিপ্রায়-তত্ত্ব (theory of intentionality) থেকে। অষ্ট্রিয়ার রাইন নদীর পার্শ্বে অবস্থিত ম্যারিয়েনবুর্গ-এ ১৮৩৮ সালে ফ্রান্জ বি. ব্রেন্টানো-এর (Franz B. Brentano) জন্ম এবং ১৯১৭-এ জুরিখে মৃত্যু। ধর্মযাজক হিসেবে নির্দিষ্ট হলেও বুর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে তিনি অধ্যাপনার কাজ করেন ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৩ অবধি। পরে তিনি ১৮৭৪ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ অবধি ভিয়েনার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। তাঁর দর্শন ছিল নব্য এরিষ্টটলবাদের অনুসারী এবং তাঁর মনোবিজ্ঞান ছিল বর্ণনাত্মক

(deseriptive)। তিনি বলেছেন যে চেতনাকে চেতনার আধেয়ের মধ্যে কখনোই পাওয়া যাবে না। তাঁর মতে চেতনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো অভিপ্রায় (intentionality)। তিনি বলেন যে মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ মন ও অভিজ্ঞতাকে ক্রিয়া হিসেবে (mode of acting) বিশ্লেষণ করা, কারণ মন ও অভিজ্ঞতা ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়। এরূপ বিশ্লেষণ হবে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এবং যৌক্তিক বা বিচারমূলক। মানসিক ক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এতে অভিপ্রায় রয়েছে। এই অভিপ্রায় মন বা চেতনাস্থিত কোন বিষয়ের (''some inner 'given' '') সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্রেন্টানোর এই অভিনব চিন্তাকে কেন্দ্র করেই উত্তরকালে অবভাস-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। ব্রেন্টানোর এই চিন্তার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর চিন্তাধারা মাইনং এবং গেষ্টল্টবাদী বা সমগ্রতাবাদী এরেনফেলস-কেও (Ehrenfels) বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে মনোসমীক্ষণের (psychoanalysis) প্রতিষ্ঠাতা সিগমুন্ড ফ্রয়েড-ও ব্রেন্টানোর অধ্যাপনা মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করতেন। বেন্টানোর প্রধান প্রধান রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে *Psychologie vom empirischen standpunkte* (১৮৭৪), *Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis* (১৮৮৯) এবং *Die vier Phasen der philosophie* (১৮৯৫)।

ব্রেন্টানো হেগেল-এর দর্শনের পরিপন্থী ছিলেন। তিনি স্বয়ং হেগেল-এর দর্শনের প্রত্যক্ষ বিরোধীতা না করলেও তাঁর ছাত্র মাইনং হেগেল-পরিপন্থী দর্শন রচনা করেছেন। মাইনং-এর দর্শনকে বলা যায় প্রান্তিক বা চরম প্লেটো-অনুসারী-মানসিক-বস্তুবাদ। ব্রেন্টানো-এর ভাববাদী দর্শনে ঈশ্বরবাদ এবং মধ্যযুগীয় দর্শনের এক সংমিশ্রন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিশেষ অবদান হলো দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মিলন ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন যে জ্ঞেয় বিষয়কে দুটোভাগে ভাগ করা যায় — একটি হলো বস্তুগত বিষয় এবং অপরটি হলো মানসিক বিষয়। চেতনা বা মনের ধর্মই হলো বহির্মুখী অধিগমন। চেতনা বিষয় ব্যতিরেকে থাকতে পারে না, চেতনা সবসময়ই কোন না কোন বিষয়ের প্রতি ধাবমান থাকে। চেতনার এই বৈশিষ্ট্যকেই ব্রেন্টানো চেতনার অভিপ্রায় (intentionality) অথবা বিষয়ানুগামীতা বলেছেন। মধ্যযুগীয় দর্শন থেকে তিনি এই ''অভিপ্রায়'' বা ''বিষয়ানুগামীতা'' শব্দটি গ্রহন করেছিলেন। ''অভিপ্রায়'' শব্দটি এখানে ইংরেজী 'intention' শব্দটির পরিভাষা নয়। আমরা সাধারণতঃ ''উদ্দেশ্য''-এই অর্থে ''অভিপ্রায়'' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অবভাস-বিজ্ঞানে এই শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। মন বা চেতনা সর্বদা কোন না কোন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এমন কখনো হতে পারে না যে চেতনা রয়েছে, অথচ ঐ চেতনা কোন বিষয়ের প্রতি ধাবিত

হচ্ছে না অথবা কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত নেই। কিন্তু চেতনা কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার অর্থ এ নয় যে চেতনা অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে। আমরা অনেক সময় কোন রকম উদ্দেশ্য ছাড়াই একটি বিশেষ বস্তুর দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে থাকি। এখানে ঐ বিশেষ বস্তুটির সঙ্গে চেতনা সংযুক্ত আছে, অথচ চেতনার কোন রকম উদ্দেশ্য নেই। মোটকথা, চেতনার অস্তিত্বের জন্য জ্ঞেয় বিষয় অবশ্য প্রয়োজন। এই অর্থেই অবভাসবিজ্ঞানে "অভিপ্রায়" শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মন বা চেতনাকে উদ্দেশ্য পদ (কর্তা) ধরলে জ্ঞেয়কে বিধেয়পদ (কর্ম) বলা যেতে পারে। এখানে উদ্দেশ্য পদের অস্তিত্বের জন্য বিধেয় পদটির প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু বিধেয় পদটির অস্তিত্ব সম্পর্কে মন বা চেতনা নিরপেক্ষ থাকে। যা হোক মাইনং বলেছেন যে জ্ঞেয় বিষয়টি বাস্তবিক-ও (real) হতে পারে আবার মানসিক বা কাল্পনিকও হতে পারে।

ব্রেন্টানো বলেন যে অভিপ্রায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। কিন্তু এই অভিপ্রায় নোঙঁর ফেলার রশির মতো নয়। অভিপ্রায় চেতনার সঙ্গে বস্তু বা বিষয়ের শুধুমাত্র সংযোগ ঘটায় না। অভিপ্রায় হলো চেতনার আকর্ষের (tentacle) মতো। আকর্ষ যেমন জীবের দেহের অংশবিশেষ, অভিপ্রায়ও তেমনি চেতনার অংশবিশেষ। আবার, আকর্ষের সাহায্যে জীব যেমন বাইরের বস্তুকে জানে, তেমনি চেতনা তার বাইরের বস্তু বা বিষয়কে অথবা কল্পনাকে অভিপ্রায়ের সাহায্যে জানে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে "এর" (of) কথাটি রয়েছে। "অভিজ্ঞতা হচ্ছে" মানেই কোন বস্তু-"এর" বা বিষয়-"এর" অভিজ্ঞতা হচ্ছে। কাজেই অভিজ্ঞতায় চেতনা তার অভিপ্রায়-রূপ আকর্ষের সাহায্যে বস্তুকে জেনে থাকে, অর্থাৎ বস্তু-"এর" অভিজ্ঞতা হয়। বস্তুর অভিজ্ঞতা বা সচেতনতার (awareness of things) চেয়ে ভাবনা, কল্পনা অথবা আত্ম-চেতনা অনেক কম শক্তিশালী। তবে ভাবনা, কল্পনা, আত্ম-সচেতনা ইত্যাদি মানসিক ঘটনাতেও কোন বস্তু বা বিষয় অভিপ্রায়রূপে বর্তমান থাকে। কাজেই বলা যায় যে মানসিক ঘটনা হলো এমন ঘটনা যাতে কোন জ্ঞেয় বিষয় অভিপ্রায়রূপে উপস্থিত থাকে ("'We can define psychical phenomena', says Brentano, 'by saying that they are phenomena which intentionally contain an object in themselves.'")। ব্রেন্টানোর এই অভিপ্রায়-তত্ত্ব হুসের্ল-এর দর্শনের একটি প্রধান আলম্বন। অবভাস-বিজ্ঞানের আর একটি প্রধান আলম্বন হলো মাইনং-এর বস্তু-তত্ত্ব *(Gegenstandtheorie)*। মাইনং বলেছেন যে জ্ঞেয়বস্তু অর্থাৎ যে বিষয়ের চেতনা হয়, তা সর্বদাই বস্তু (matter অথবা physical objects) হবে, এমন নয়। জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয়ের একমাত্র স্বরূপ এই যে এটি হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এটি জ্ঞাতার ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। মাইনং বলেন যে বস্তু নয় এমন বিষয়ের প্রতিও চেতনা ধাবিত হতে পারে। গণিতশাস্ত্রের

সংখ্যা এবং সংখ্যাসম্পর্কীয় বিষয়, নীলত্ব, ভালোই ইত্যাদি; যুক্তি-বিজ্ঞান সম্মত বচন, ইত্যাদিও জ্ঞেয়বস্তু হতে পারে। মোটকথা, যেবিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা যায় অথবা যে বিষয় উল্লেখ করা যায়, তা-ই জ্ঞেয়-বিষয় বা চেতনার অভিপ্রায়-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

যা হোক, ওপরোক্ত আলম্বন দুটি গ্রহন করে হুসের্ল তাঁর দর্শনচিন্তা আরম্ভ করেন। হুসের্ল ব্রেন্টানো এবং মাইনং-এর চেতনা সম্পর্কীয় অভিমত মেনে নিলেন। তিনিও বললেন যে চেতনা আকর্ষের মতো বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে। তবে হুর্সেল আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন যে এই একই কারনে চেতনাকে বস্তু বা বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ অথবা অনুধাবন করা যায় না। চেতনার বিশ্লেষণ করতে হলে চেতনার বাইরে অবস্থিত অথচ চেতনার সঙ্গে যুক্ত যে বিষয় রয়েছে তার সম্পর্কে যে চেতনা বা সচেতনতা (awareness) তার বিশ্লেষণ বা অনুধাবন করতে হবে। এই সচেতনতা-ও চেতনাতেই উপস্থিত থাকে চেতনার একটি অংশ হিসেবে। বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে যে চেতনা রয়েছে সেই চেতনা সম্পর্কে যে সচেতনতা আছে তাঁর বর্ণনার মাধ্যমেই চেতনাকে বোঝা সম্ভব, অন্য কোন ভাবে নয়। চেতনার এরূপ অনুধাবন-তত্ত্বকেই অবভাস-বিজ্ঞান বলে।

কিন্তু এখানে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়। বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে যে চেতনা তার বিশ্লেষণ করবে কে? অথবা তার বর্ণনা দেবে কে? অবশ্যই চেতনার এই বর্ণনা স্বয়ং চেতনাকেই দিতে হবে, কেননা বিষয়ীর তো আর দুটো চেতনা থাকতে পারে না। হুর্সেল বলেন যে চেতনার পক্ষে এরূপ বর্ণনা দেয়া সম্ভব, কারণ চেতনা যেমন আকর্ষের মতো বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি এই আকর্ষ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মধ্যে স্থাপন করতে পারে। এমনিভাবে চেতনা আপন অভ্যন্তরের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করতে পারে। আপন অভ্যন্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের প্রক্রিয়ার এরূপ বিশ্লেষণকে বলা হয় অন্তর্মুখীনতা (reflection) বা আত্ম-সচেতনতা (self-consciousness)। এমনিভাবে চেতনা যেমন বিষয়কে জানতে পারে, বিষয়ীকেও তেমনি। তবে আত্ম-সচেতনতাকে অনুধাবন করার সময় চেতনা নিজেই নিজের বিষয় (object) হয়ে ওঠে। আত্ম-সচেতনতাকে অনুধাবন করার সময় চেতনাকে অবশ্যই বাইরের বিষয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে এবং নিজেকে স্থির করে বিষয়ে পরিণত করতে হবে। চেতনা নিজের অন্তরের মধ্যে নিজেকে অনুধাবন করতে পারে না। নিজেকে অনুধাবন করতে হলে নিজেকেও বাইরের বিষয়ের মতো তৈরী করতে হবে। অর্থাৎ অভিপ্রায়-রূপ আকর্ষটিকে নির্বীর্য করে ('anesthetise') বিষয় থেকে সরিয়ে এনে অচেতন বিষয়ের মতো করতে হবে — যে অচেতন বিষয়ের সঙ্গে অথবা চেতন বিষয়ের সঙ্গে এই অভিপ্রায়

এতক্ষণ যুক্ত ছিল তার মতো এই অভিপ্রায়-যুক্ত চেতনাকে তৈরী করতে হবে (বিষয়রূপে)। প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতায় আকর্ষের সঙ্গে বিষয়ের যে সন্নিকর্ষ হচ্ছে সেই সন্নিকর্ষের স্বরূপ জানা অবভাস-বিজ্ঞানের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। বিষয়-বিষয়ী সম্পর্ক থেকে সাময়িকভাবে আভ্যন্তরিন চেতনাকে গুটিয়ে আনা সম্ভব বলেই চেতনা আত্মস্থ হতে পারে এবং চেতনার সঙ্গে বিষয়ের যে-সন্নিকর্ষ হয় তাকে অনুধাবন করতে পারে। চেতনা কী প্রত্যক্ষ করছে তা লক্ষ্য করা এবং তার বর্ণনা করাই অবভাস-বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।

এখানে 'অবভাস' কথাটিকে আরও একটু পরিস্কার করে বোঝা প্রয়োজন। হুসের্ল-এর নীতি-বাক্য (motto) হলো ঃ "ঠিক বস্তুতে ফিরে যাও" ("back to things themselves" অথবা "*zu den zachen*")। বস্তুকে দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করা যেতে পারে। প্রথমতঃ আমরা ভাবতে পারি যে কোন বস্তু আছে, অর্থাৎ আমাদের চেতনার বাইরে কোন বস্তু চেতনা-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল রয়েছে। আমাদের চেতনার সাহায্যে ঐ বস্তুটির জ্ঞান আমাদের হচ্ছে। এটি হলো আমাদের সাধারন ধারনা এবং বৈজ্ঞানিক ধারনা। একে হুসের্ল স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী (natural attitude) বলেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহাতীত। এখানে বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের একটা পূর্বানুমান। আমরা ভাবছি যে যেহেতু আমরা বস্তু দেখতে পাচ্ছি, সে হেতু বস্তু অবশ্য অস্তিত্বশীল, কারণ যা অস্তিত্বশীল নয় তা অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে না। যা হোক, অবভাস-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে এই স্বাভাবিক দৃষ্টভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটানো হয়। এখানে আমরা বস্তুর অস্তিত্বের বিষয়টিকে এবং বস্তুর গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যাবলির অস্তিত্বের বিষয়টিকে সাময়িকভাবে পর্যবেক্ষণের পরিধির বাইরে রাখি। আমরা ভাবি, বস্তুটির প্রকৃত অস্তিত্ব এবং তার গুণাবলির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি নেই সেটি আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। অর্থাৎ আমরা আমাদের চেতনাকে (জ্ঞাতার চেতনাকে) বস্তুর এবং তার গুণাবলির অস্তিত্বের প্রশ্ন থেকে সাময়িকভাবে বিযোজিত করে রাখি ("Keep disconnected")। বস্তুর অস্তিত্ব তাই এখন অনিশ্চয়তার (suspensoin) মধ্যে থাকবে। "বস্তুটির অস্তিত্ব আছে" এ-ও আমরা বলব না। স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে এভাবে কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত রাখাকে বলা বলা হয় বন্ধনীযুক্তকরণ (epoché)। Epoché-র তাৎপর্য হবে এই। কোন্ অপরিহার্য শর্ত পালিত হলে বলা যাবে আমাদের মানস ক্রিয়া, যথা বস্তু প্রত্যক্ষ বা বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাস ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে? অর্থাৎ বস্তু মুখী মানস ক্রিয়া কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল? বলা বাহুল্য এখানে বস্তুর অস্তিত্ব বা অনাস্তিত্বের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। 'অবভাস' শব্দটিকে কান্ট-ও ব্যবহার করেছিলেন। কান্ট-এর 'অবভাস' ও হুসের্ল-এর 'অবভাসের' মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

কান্ট বলেছিলেন যে প্রকৃত বস্তু (thing-in-itself অথবা noumenon) আমরা কখনো দেখতে পাবো না, কেননা প্রকৃত বস্তু থেকে উপজাত উপাত্তগুলো (অনুভূতিগুলো) দেশ ও কালের আকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এলে আমরা ও-গুলোকে আমাদের জ্ঞানাকারগুলোর নির্দেশানুযায়ী সাজাই এবং তবেই আমাদের জ্ঞান হয়। কাজেই প্রকৃত বস্তু (অথবা দ্রব্য) আমরা দেখতে পারি না। বস্তুকে আমরা যে রূপে জানি তাকে কান্ট অবভাস বলেছেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এই অভাসের পশ্চাতে প্রকৃত বস্তু রয়েছে। পক্ষান্তরে হুসের্ল এই অবভাসের পশ্চাতে প্রকৃত বস্তু আছে কি নেই সে প্রশ্নই তোলেননি। এরূপ প্রশ্নকে তিনি বন্ধনীযুক্তকরনের সাহায্যে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেছেন। তিনি কেবলমাত্র বস্তুর অবভাসে আগ্রহী। বস্তুতে তার কোন আগ্রহই নেই। আমরা পরে জানবো যে হুসের্ল-এর মতে আমাদের চেতনাই বস্তু গঠন করে। অথবা বলা যায় যে আমাদের চেতনাই অবভাসকে গঠন করে। চেতনা এই অবভাসে কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করে, কিছু অর্থ (meaning) যুক্ত করে এবং এই অবভাসের একটি নাম-ও কখনো কখনো দিয়ে থাকে। এমনিভাবে অবভাসকে বলতে গেলে চেতনাই গঠন করে থাকে। হুসের্ল-এর অনুসন্ধানের বিষয় বা উদ্দেশ্য হলো কেমন করে আমাদের চেতনা অবভাসকে এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও অর্থ-যুক্ত করে থাকে। তিনি বলেছেন যে যেহেতু এই বৈশিষ্ট্য এবং অর্থ আমাদের চেতনা থেকেই উদগত হয়, সেহেতু চেতনাকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা এগুলোর ক্রিয়াপদ্ধতি বুঝতে পারবো। কিন্তু বস্তু থেকে চেতনাকে বিযোজিত করলেও অবভাস থেকে চেতনাকে বিযোজিত করা সম্ভব নয়, কেননা চেতনা সর্বদাই "কোনকিছুর-'এর'" ('of' something) হয়ে থাকে। এখানে 'কোন কিছু'-ই হলো অবভাস। অবভাস বাইরে অবস্থিত ('out there') থাকলেও অভিপ্রায় হিসেবে চেতনায় উপস্থিত থাকে। হুসের্ল বলেন যে চেতনায় অভিপ্রায়রূপে উপস্থিত এই অবভাসকে বিশ্লেষণ ও বর্ণন করলেই চেতনার স্বরূপ বোঝা যাবে, কেননা চেতনাই অবভাসটিকে বৈশিষ্ট্য ও মূল্য দিয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ঘটনার (facts) মধ্যে যে যুক্তি-বৈজ্ঞানিক আকার (form) রয়েছে সেগুলোকে অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হবে। এভাবে এসব আকারের সামান্য নিরপেক্ষ স্বভাবটি (universal categorical nature) অনুধাবন করা যাবে। হুসের্ল-এর *Logical Investigations* নামক পুস্তকের প্রথম খন্ডে এই ছিল অবভাস বিজ্ঞানের মূলবক্তব্য।

কিন্তু এই পুস্ককের দ্বিতীয় খন্ডে তিনি তাঁর পদ্ধতির বিস্তার করেন এবং একে আধিবিদ্যক সমস্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। ফলে অবভাস-বিজ্ঞানের অর্থ একটু ভিন্ন হয়ে ওঠে। প্রথম খন্ডে তিনি কেবলমাত্র বিষয়ীগত পদ্ধতির (subjective process) বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খন্ডে তিনি অবভাস

বিজ্ঞানকে একটি কল্প-বিজ্ঞানে (eidetic science) পরিণত করেন। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য হলো বস্তুর মানসিক মূর্তি তৈরী করা (to make mental images) এবং এর সাহায্যে ভাবকল্প (phantasy) তৈরী করা। বিভিন্ন প্রকার ভাবকল্প থেকে তখন অবভাসের সারসত্তা (essence) বের করা যাবে। এমনিভাবে তিনি বিষয়ীগত প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে তার ভেতর যে আদর্শগত সম্ভাবনাময় (ideal possibiliies) আধেয় আছে তা অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। চেতনা অবভাসকে অর্থ প্রদান করেছে। এই অর্থ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। চেতনা তাই সম্ভাবনাময়। আবার এই অর্থ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল নয় অথবা বহির্জগতের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই এই সম্ভাবনাগুলো আদর্শস্থানীয়। হুসের্ল-এর প্রশ্ন ঃ কেমনভাবে একটি বিশেষ অবভাসকে আমাদের চেতনা একটি বিশেষ অর্থ প্রদান করে? একাধিক আদর্শগত সম্ভাবনাময় অর্থ থেকে কেমন করে চেতনা একটি বিশেষ অবভাসের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থ চয়ন করে? অথবা, এই আদর্শগত সম্ভাবনাময় অর্থের আধেয় যে চেতনা তার স্বরূপ কী? কাজেই *Logical Investigations* নামক পুস্তকের প্রথম খন্ডে তিনি যুক্তি-বিজ্ঞানকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় খন্ডে তা-ই তিনি দিলেন অবভাস-বিজ্ঞানকে। ফলে তাঁর দর্শন অতিবর্তী বা ভাববাদী (transcendental অথবা idealistic) দর্শনে পরিণত হলো। কারণ এখানে তিনি অভিজ্ঞতা-পূর্ব চেতনার স্বরূপ জানতে আগ্রহী।

অবভাস-বিজ্ঞানের অনুসন্ধেয় বিষয়কে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন চেতনা একটি অঞ্চল, অবভাস আর একটি অঞ্চল, ইত্যাদি। এসব আঞ্চলিক অধ্যয়নকে (regional study) আঞ্চলিক অবভাস-বিজ্ঞান (regional phenomenology) বলে। চেতনার অঞ্চলে যে অবভাস-বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়ে তাঁর সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনার মিল থাকলেও এ-দুয়ের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে অনেক। মনোবিজ্ঞান হলো ঘটনাসম্পর্কীয় বিজ্ঞান, প্রকৃত ঘটনা নিয়ে এর আলোচনা হয়। কিন্তু অবভাস-বিজ্ঞান হলো সারসত্তার বিজ্ঞান। দেশ ও কালে অবস্থিত প্রকৃত ঘটনাকে অনুসন্ধান করে মনোবিজ্ঞান, আর দেশ ও কালের অতীত অবভাসের সারসত্তাকে ঘিরে হয় অবভাস-বৈজ্ঞানিক গবেষণা। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাতার স্বাভাবিক মনোভাব (natural attitude) থাকে। অর্থাৎ জ্ঞাতা জ্ঞেয় সম্পর্কে কতকগুলো পূর্বানুমানের মাধ্যমে জ্ঞেয়কে অনুধাবন করে। পক্ষান্তরে, অবভাস-বিজ্ঞানে প্রকৃত ঘটনা এবং স্বাভাবিক মনোভাব বা প্রবণতার থেকে বিযুক্ত শুদ্ধ চেতনার স্বরূপ বর্ণনার প্রয়াস থাকে। বিশুদ্ধ চেতনা ও স্বাভাবিক প্রবণতা মধ্যবর্তী একটি স্তরের আলোচনাও অবভাস-বিজ্ঞানে হয়ে থাকে। এরূপ আলোচনাকেই বলা হয় অবভাস-বিজ্ঞান-মূলক মনোবিজ্ঞান। এমনিভাবে অবভাস-বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি শাখা গড়ে উঠেছে।

যেমন, ম্যাক্স শেলারের (Max Scheler) নৃতত্ত্বমূলক অবভাস-বিজ্ঞান, ফ্যান্ডারের (Pfander) মনোবিজ্ঞানমূলক অবভাস-বিজ্ঞান, ইত্যাদি।

আমরা দেখেছি, মনোবিজ্ঞানসর্বস্ববাদের প্রতিবাদ স্বরূপ অবভাস-বিজ্ঞানের জন্ম। মনোবিজ্ঞানসর্বস্ববাদ অভিজ্ঞতাবাদের একটি প্রকরণ মাত্র। এর মতে যুক্তি-বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য জিনিস মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত। এসব বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তি যখনই যা ভাবুক না কেন, তা ব্যক্তির নিজের মনোবিজ্ঞানসর্বস্ববাদের মতে এমনকি যুক্তি-বিজ্ঞান কিম্বা গণিতশাস্ত্রে মতো বিষয়গুলোও এমনিভাবে ব্যক্তির (বিষয়ীর) মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যাবলিরদ্বারা প্রভাবিত। হুসের্ল এর প্রতিবাদ করে বলেন যে প্রতিটি ব্যক্তির মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যাবলি ভিন্ন ভিন্ন। ফলে এদের প্রত্যক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে ব্যক্তিবর্গের মতের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে কী করে? সুতরাং এই সাদৃশ্য অবশ্যই ব্যক্তিবর্গের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলির উর্দ্ধে থাকবে। হুসের্ল-এর মতে এই সাদৃশ্যের ভিত্তিভূমি নিশ্চয় অতিবর্তী বিশুদ্ধ চেতনায় রয়েছে। কাজেই ব্যক্তিগত বা বিষয়ীগত প্রত্যক্ষণকে অতিবর্তী বিষয়ীগত (transcendental subjectivity) করে তুলতে হবে। এরপর ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষণকে বিশ্লেষণ না করে অতিবর্তী বিষয়ীগত প্রত্যক্ষণকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এরূপ বিশ্লেষণ করলে বিশুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত সামান্য (universal) বিষয়গুলোকে অনুধাবন করা যাবে। আর এই বিষয়গুলোই হলো বস্তুর বা অবভাসের সারসত্তা। এই সামান্য বিষয়গুলো ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিশ্চিতভাবে (apodictically) রয়েছে। এই সামান্যগুলো হলো অবভাসের সারসত্তা বা ভাবকল্প (essence অথবা eidos)। হুসের্ল বলেছেন, এই সারসত্তাকে কেবলমাত্র স্বজ্ঞার (intuition, অথবা জার্মান ভাষায় *Wesensschau*) সাহায্যে অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন, এই স্বজ্ঞাই জ্ঞেয়-বিষয়ের (অবভাসের) স্রষ্টা, আবার এ স্বজ্ঞাই ঐ জ্ঞেয় বিষয়ের যাথার্থ্যের (অবভাসটি সত্য অথবা অসত্য) আধিকারিক (authority)। অবভাসের (বা বস্তুর) সারসত্তাকে এমনভাবে জানার ফলে অভিজ্ঞতার (বা জ্ঞেয় বিষয়ের) অভিজ্ঞতা-পূর্ব (*a priori*) কাঠামো জানা সম্ভব। সারসত্তাকে হুসের্ল ভাবকল্প (eidos) বলেছেন এবং তিনি বলেন যে প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য ব্যষ্টি বস্তুগুলোকে (real or possible individuals) আদর্শস্থানীয় ভাবকল্পের দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাবা যেতে পারে। আমরা অবভাসকে বা বস্তুকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করে থাকি, কিন্তু এই আদর্শস্থানীয় ভাবকল্পকে কি প্রত্যক্ষণ করা যায়? এ-প্রশ্নের উত্তরে হুসের্ল বলেন যে এই আদর্শস্থানীয় ভাবকল্পকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমরা নিশ্চয় জানতে পারি, কেননা ব্যষ্টি বস্তুগুলো আদর্শস্থানীয় ভাবকল্পের দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখানে প্লেটোর সঙ্গে হুসের্ল-এর সাদৃশ্য স্পষ্ট। যা হোক, অবভাস-বিজ্ঞানী ভাবকল্পকে শুধুমাত্র অনুধাবন

করেই ক্ষান্ত হন না। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আদর্শস্থানীয় ভাবকল্পে রূপান্তরিত করতে চান। ভাবকল্পকে বিষয়ী বিষয়ের একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং নিজের অথবা তাৎপর্য-কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে গঠন করে। বিষয়ীর দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট শারীরীক, মানসিক ও পরিবেশগত বাতাবরনে বিষয়ের প্রত্যক্ষগত উপস্থিতি ঘটে। বিষয়ী অর্থে এখানে চেতনার ধারাবাহিকতাকে বুঝতে হবে। চেতনার ধারাবাহিকতার মধ্যে অবশ্যই কাল (time) রয়েছে। কাজেই অবভাসকে কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সুতরাং অবভাস একটি জটিল পরিস্থিতিতে উপস্থিত। এই জটিল প্রেক্ষাপটেই আমরা যে-কোন বিষয়কে বা বস্তুকে অথবা অবভাসকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। কাজেই বস্তুর অভিজ্ঞতাকে শুধুমাত্র অনুভূতি-উপাত্ত (sense-data) দিয়ে ব্যাখ্যা করলে বড় রকমের ভুল করা হবে। অনুভূতি- উপাত্তকে জ্ঞানের একমাত্র উৎসস্থল বলা চলেনা। অবভাস-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তাই চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট আনুসঙ্গিক উপাদানগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে (বন্ধনীযুক্ত করে এবং অবভাস-বৈজ্ঞানিক বিজারন করে) কেবলমাত্র শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত বস্তুর পরমসত্তাকে অনুধাবন করার চেষ্ট হয়ে থাকে।

অবভাস বৈজ্ঞানিক বিজারন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানের প্রথম উদ্দেশ্য হলো ব্যষ্টি বা অবভাসের সারসত্তা অনুধাবন করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো বিশুদ্ধ চেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করা। ব্যষ্টি বস্তুর সারসত্তা অনুধাবন করা তখনই কেবল সম্ভব যখন ঐ বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত পূর্বানুমানগুলোকে ঐ বস্তু বা অবভাস থেকে কল্পনায় বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত করা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃত্তত্ব বলে যে সারসত্তা আছে তা অবশ্যই কোন একটি বিশেষ বাস্তব বৃত্তে রয়েছে। এখন, যদি কল্পনায় ঐ বিশেষ বৃত্তটিকে একবার অধিকতর বড় করি এবং পরক্ষণে অধিকতর ছোট করি, এবং এমনিভাবে বৃত্তটির আকারের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটাই, তাহলে ঐ বিশেষ বৃত্তটির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য যা-ই হোক না কেন, (সামান্য) বৃত্তের সারসত্তাকে জানা যাবে। এই সারসত্তা হলো বৃত্তের ভাবকল্প (eidos)। বস্তুর বা অবভাসের সারসত্তা নিষ্কাসন করার এরূপ প্রক্রিয়াকে হুসের্ল অবভাস-বৈজ্ঞানিক লঘুকরন (phenomenological reduction অথবা epoché) বা অবভাস-বৈজ্ঞানিক বিজারন বলেছেন। হুসের্ল বলেন যে এই বিজারন প্রক্রিয়ার বা পদ্ধতির মোট পাঁচটি সোপান রয়েছে। অবশ্য এই পাঁচটি সোপান অতিক্রম করার পূর্বে বন্ধনীযুক্তকরন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, অর্থাৎ ভাবতে হবে যে বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এটি একটি সত্য বস্তু কিনা অথবা এর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কিনা তা আমরা জানতে চাইবো না। তবে অবভাসটি (বা দৃষ্ট বস্তুটি) যে আমাদের বাইরে উপস্থিত

আছে, এ-বিষয় আমরা নিশ্চিত। এরপর ঐ পাঁচটি সোপান অতিক্রম করতে হবে। এই সোপনাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **মনোবৈজ্ঞানিক বিজারন বা লঘুকরন (psychological reduction)** ঃ এখানে চেতনার সারসত্তাকে ঘটনা বা বস্তু থেকে মুক্ত করতে হবে। ঘটনা বা বস্তু যা-ই হোক না কেন অথবা যেরূপই হোক না কেন, আমরা শুধু ঐ বস্তু বা ঘটনার যে প্রতিচ্ছবি আমাদের চেতনায় রয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। বাইরের বস্তু এবার চেতনায় আশ্রয় নিল। অর্থাৎ এখন আর বাইরের অবভাসের কথা ভাববো না, ভাববো চেতনায় অবস্থিত অবভাসের কথা।

২. **ভাবকল্পিক বিজারন (eidetic reduction)** ঃ এবার চেতনায় অবস্থিত অবভাসটিকে ইচ্ছানুরূপে বিভিন্ন ভাবে মুক্ত-কল্পনায় (phantasu) পরিবর্তিত করবো এবং দেখবো ঐ অবভাসটির সারসত্তাটি কীরূপ। পূর্বে বৃত্তের বিজারনের যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে সেটি এখানে প্রযোজ্য। এরূপ বিজারনের ফলে বৃত্ত বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তার একটি ভাবকল্প আমরা পাব।

৩. **অবভাস-বৈজ্ঞানিক বিজারন (phenomenological reduction)** ঃ যে ভাবকল্প আমরা পেলাম তা অবশ্যই বিষয়ীর বিশুদ্ধ চেতনায় বর্তমান। কাজেই বিশুদ্ধ চেতনায় উপস্থিত এই ভাবকল্পকে অনুধাবন করলে নিশ্চয় বিশুদ্ধ চেতনার স্বরূপ বোঝা যাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে এই বিশুদ্ধ চেতনা একক বা ব্যক্তিক অথবা অবচ্ছিন্ন। এই বিশুদ্ধ চেতনাকে বিশুদ্ধ-বিষয়ীত্ব (pure subjectivity) বলা হয়।

৪. **অতিবর্তী অহং (transcendental ego অথবা transcendental subject) অনুসন্ধান** ঃ অবভাস-বৈজ্ঞানিক বিজারনের ফলে যে বিশুদ্ধ-বিষয়ীত্ব পাওয়া গেল তা হলো অবচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টি অহং। অথচ তাতে যে ভাবকল্প রয়েছে তা সামান্য (universal)। এই সামান্য ভাবকল্প অবচ্ছিন্ন সকল অহং-এই বর্তমান। তাহলে বুঝতে হবে যে অবচ্ছিন্ন অহংসমূহ যেমন রয়েছে, তেমনি এগুলোর উর্দ্ধে অতিবর্তী কোন সামান্য অহং রয়েছে যা প্রতিটি অবচ্ছিন্ন অহং-এ একই ভাবকল্প তৈরী করছে। এই সামান্য অহংকে বলা হয় অতিবর্তী অহং বা অতিবর্তী বিষয়ী।

৫. **চেতনার বিশুদ্ধ প্রবাহ ("pure flow of consciousness) অনুধাবন** ঃ অতিবর্তী অহং-এ আমরা ভাবকল্পগুলো দেখতে পেয়েছি। অতিবর্তী অহং থেকে ভাবকল্পগুলোকে বিচ্ছিন্ন করলে অবশ্যই অতিবর্তী বিশুদ্ধ চেতনাকে জানা যাবে। হুসের্ল বলেন যে এই অতিবর্তী বিশুদ্ধ চেতনা হলো কেবলমাত্র বিশুদ্ধ চেতনার এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এখানে ভারতীয় বৌদ্ধ-দর্শনের সঙ্গে হুসের্ল-এর চিন্তাধারার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হতে পারে ঃ বিশুদ্ধ চেতনার এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে কি কোন কিছুই উপস্থিত নেই? হুসের্ল বলেন যে বিশুদ্ধ চেতনার এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে রয়েছে কেবলমাত্র অভিপ্রায় (intentionality)। এই অভিপ্রায়ের জন্যই জ্ঞেয়ত্বের (objectivity) প্রয়োজন, কেননা জ্ঞেয়ত্ব না থাকলে অর্থাৎ অভিপ্রায়ের বিষয় না থাকলে অভিপ্রায়ও থাকতে পারে না। আবার বিশুদ্ধ চেতনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ যেমন রয়েছে, তেমনি জ্ঞেয়ত্বের প্রবাহও থাকতে হবে। তাঁর *Cartesian Meditations* নামক পুস্তকে হুসের্ল বলেছেন যে বিশুদ্ধ চেতনার প্রবাহ নিজের অস্তিত্বের জন্যই জ্ঞেয়ত্বের প্রবাহ সৃষ্টি করে। এসময় অতিবর্তী বিশুদ্ধ চেতনা অর্থাৎ বিশুদ্ধ অতিবর্তী চেতনার প্রবাহ একদিকে অতিবর্তী অহং-এর রূপ পরিগ্রহ করে, এবং অন্যদিকে জ্ঞেয়ত্বের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তখন একদিকে থাকে অতিবর্তী অহং আর অপরদিকে থাকে এই চেতনার সৃষ্টি-করা অবভাসিক জগৎ। কিন্তু জগৎ সৃষ্ট হবার পর অতিবর্তী অহং ব্যষ্টিচেতনার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এই ব্যষ্টি-চেতনা-সমুদয় প্রকৃত ব্যক্তি সমুদয়ে (concrete individuals) পরিণত হয়। আর ব্যক্তির পরিপার্শ্বের অবভাসসমুদয় বা বস্তু সমূহ ব্যক্তির নিজস্ব জগৎ (Umwelt) রচনা করে।

এখানেই হুসের্ল-এর দর্শনের পরিসমাপ্তি হলে সে দর্শন হতো অহং-কেবলং-বাদী বা আত্মস্থ দর্শন (solipcism)। একক ব্যষ্টি ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি থাকতো না, কারণ ঐ ব্যষ্টি ব্যক্তির চেতনার দ্বারাই আর সবকিছু রচিত বলে মনে হতো। ব্যক্তি ভাবতো যে অপর ব্যক্তিবর্গ এবং জগৎ-রূপী অবভাসসমূহ তার চেতনার দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু হুসের্ল বলেন যে এরূপ হলে প্রকৃত অপরাপর ব্যক্তি-চেতনাও ঐ ব্যক্তির মতোই নিজ নিজ জগৎ সৃষ্টি করতো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অপর সকল ব্যক্তিকে অ-যথার্থ বা অসত্য মনে করতো। হুসের্ল অপর ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু অপর ব্যক্তিরও চেতনা আছে, এ আমরা জানবো কেমন করে? হুসের্ল বলেছেন যে অপরাপর ব্যক্তি-চেতনার অস্তিত্ব বোঝার একমাত্র মাধ্যম হলো ব্যক্তির দেহ (body)। এই দেহ এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির সংযোগ ঘটায়। দেহের একদিকে যেমন চেতনা রয়েছে, তেমনি অপর দিকে রয়েছে জগৎ। দেহের সাহায্যেই আমরা জগতের বিষয়সমূহকে দুটোভাগে ভাগ করতে পারি — চেতনাহীন বস্তু এবং চেতনার কেন্দ্র বা অপর ব্যক্তি। চেতনা যেমন এর সঙ্গে যুক্ত দেহটিকে সরাসরি (directly) জানছে, তেমনি এই দেহের সাহায্যে অপর ব্যক্তির দেহ তথা দেহে অবস্থিত চেতনাকেও জানতে পারছে। বিষয়টিকে নিম্নের ছকের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে ঃ

চেতনা → দেহ → অপর দেহ → অপর চেতনা

এভাবে অপর ব্যক্তি গঠিত হলে ব্যক্তি আর বিবিক্ত থাকে না। অপর ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষগত বিষয়াদির (দেহের) মাধ্যমে তখন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আন্তঃ সংযোগ (intersujectivity) হতে পারে এবং এরূপ সংযোগের ফলে এক সাংস্কৃতিক জগৎ *(Kulturwelt)* রচিত হয়।

হুসের্ল পরবর্তী সময়ে 'জীবন-জগৎ' *(Lebenswelt)* নামক এক নতুন জগতের কথা বলেছেন। একে তিনি বৈজ্ঞানিক-জগৎ (scientific world) থেকে পৃথক করে দেখেছেন। সাধারনভাবে যে প্রাকৃতিকজগৎ-কে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটি হলো বৈজ্ঞানিক জগৎ। এ-জগতে বিষয়ীর দ্বারা আরোপিত অর্থ নেই। এ-জগতে গোলাপ একটি বস্তু মাত্র, প্রেমের প্রতীক নয়। হুসের্ল বলেন যে এই বৈজ্ঞানিক জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফলে তা অর্থপূর্ণ (meaningful) এক অন্য জগতে রূপান্তরিত হয়। আমরা তখন প্রকৃতি, জগৎ এবং অপর ব্যক্তিবর্গকে যেমন-আছে-তেমন ভাবে দেখিনা; জগতের প্রতিটি বিষয়কে আমরা এক একটি অর্থ প্রদান করি; এবং এভাবে জগতের সবকিছুকে নিয়েএক বিরাট অর্থের জগৎ (world of meanings) তৈরী করি। এই জগৎ-ই হলো আমাদের জীবন-জগৎ। জীবনের শেষ পাদে এসে হুসের্ল তাঁরর অবভাস-বিজ্ঞানে এই জীবন-জগতের বিশ্লেষণ ও অনুধাবনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

অবভাস-বিজ্ঞানের বিস্তার

হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানের লক্ষ্য প্রধানতঃ ছিল জ্ঞানাতাত্ত্বিক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে চেতনা কী করে অবভাসকে সৃষ্টি করে — এই ছিল অবভাস-বিজ্ঞানের মূল অনুসন্ধানের বিষয়। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরমতাত্ত্বিক ভাবনায়ও আত্ম নিয়োগ করেছিলেন — তিনি জানতে চেয়েছিলেন চেতনার স্বরূপ, বিশুদ্ধ চেতনা-প্রবাহের স্বরূপ, ইত্যাদি। কিন্তু হুসের্ল-এর উত্তরাধিকারীগণ অবভাস-বিজ্ঞনকে জ্ঞানের অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানকে বলা হয়েছে বিশুদ্ধ অবভাস-বিজ্ঞান, আর জ্ঞানের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে এমন অবভাস-বিজ্ঞানকে ঐ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রানুসারে সাধারণতঃ পরিচিত করা হয়ে থাকে। যেমন, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে এমন অবভাস-বিজ্ঞানকে বলা হয় মনোবৈজ্ঞানিক অবভাস-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে এমন অবভাস-বিজ্ঞানকে বলা হয় নৃতাত্ত্বিক অবভাস বিজ্ঞান, ইত্যাদি।

নৃতাত্ত্বিক অবভাস-বিজ্ঞান

নৃতাত্ত্বিক অবভাস-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ম্যাক্স শেলার (Max Scheler) (১৮৭৪-১৯২৮)। তিনি ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দার্শনিক রুডল্ফ ইউকেন-এর (Rudolf Eucken) ছাত্র। ইউকেন আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন যে দর্শন কোন বিশেষ জ্ঞান অথবা সামান্য জ্ঞানের অনুসন্ধান করে না, দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জীবনের রহস্যকে বোঝা। তাই তিনি বলতেন যে দর্শন মানেই জীবন-দর্শন। শেলার প্রথম জীবনে ইউকেন-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। কিন্তু শেলার মিউনিকে (Munich) হুসের্ল-চক্রের সদস্য হয়ে ক্রমে ইউকেন থেকে দূরে সরে আসতে লাগলেন। তিনি তখন অবভাস-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মনোবৈজ্ঞানিক, নীতিবৈজ্ঞানিক ও সমাজ-বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হলেন। ব্রেন্টানো-এর প্রভাবও শেলার-এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। শেলার বিশ্বাস করতেন যে বিষয়ের সারসত্তা এবং অভিপ্রায়- যুক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে আবশ্যিক (necessary) সাদৃশ্য রয়েছে। শেলার-এর বিশেষ অবদান রয়েছে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, আবেগ সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন যে ভালোবাসা বা সহানুভূতির সাহায্যে সত্তাকে অধিকতর পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

শেলার-এর দার্শনিক জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১৯২০ অবধি তিনি অবভাস-বিজ্ঞানের সমস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। পরের চার

বছর তিনি ধর্ম-দর্শন নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর এই পরিবর্তন আসে তাঁর ক্যাথলিক মতবাদে দীক্ষিত হবার ফলে। জীবনের শেষ চার বছর তিনি আধিবিদ্যক চিন্তাধারায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অধিবিদ্যাতে প্রাণবাদ (vitalism) ও সর্বেশ্বরবাদের (pantheism) ছায়া পবিলক্ষিত হয়।

শেলার জ্ঞানকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যার পরিমন্ডলে রয়েছে বিশেষ বিশেষ বস্তু (particulars)। দ্বিতীয়তঃ, অবভাস-বৈজ্ঞানিক সারসত্তার জ্ঞান। তৃতীয়তঃ, আধিবিদ্যক পরমসত্তার জ্ঞান। এই তিন শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যে শেলার অবভাস-বৈজ্ঞানিকসারসত্তার জ্ঞান ও আধিবিদ্যক পরমসত্তার জ্ঞানে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। শেলার-এর সমসাময়িক দার্শনিক জগতে মূল্যকে (values) অনেকেই আ পেক্ষিক মনে করতেন। কিন্তু তিনি এরূপ মতবাদকে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যক্ষ বা ধারনার যেমন বিষয়ীগত ও বিষয়গত দিক রয়েছে, তেমনি মূল্যগুলোরও বিষয়ীগত এবং বিষয়গত দিক রয়েছে। এই মূল্যগুলোকে ক্রমোন্নত স্তরে সাজানো যেতে পারে। সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে অনুভূতিমূলক মূল্য এবং তার ওপরে জীবনমূলক মূল্য। আবার জীবনমূলক মূল্যের মধ্যে রয়েছে নান্দনিক, নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্য। শেলার-এর মতে মূল্যগুলো কালাতীত (non-temporal) অথচ এদের বৈষয়িক যাথার্থ্য রয়েছে।

শেলা-এর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ব্যক্তির (person) ধারনা। শেলার বলেন যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক বিষয় যেমন নয়, তেমনি সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্মিক বিষয়ও নয়। ব্যক্তি হলো মূর্ত বিষয় এবং সারসত্তার ঐক্য। কারণ, ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়ার অধ্যাত্মিক এবং অভিপ্রায়-সম্পর্কীয় দৃষ্টিকোণের বা পরিপ্রেক্ষিতের মিলন ঘটে। ব্যক্তির এই মিলন ক্ষেত্রের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বর-চেতনা বা ঈশ্বররের ধারনা। মানুষের অতি উন্নতমানের বিশিষ্ট গুণাবলির সঙ্গে ঈশ্বরের সাদৃশ্য রয়েছে। পরবর্তি দার্শনিক জীবনে শেলার অবশ্য বস্তুর সামগ্রিকতাকেই ঈশ্বর ভেবেছেন। অবভাস-বিজ্ঞানে শেলার এর মুখ্য অবদান এই যে তাঁর মতে অবভাস-বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ সত্তার (being) মন বা মূল্যের ব্যাখ্যন। এরূপ ব্যাখ্যানের ভিত্তি হবে বিষয়ের সারসত্তা এবং অভিপ্রায়-যুক্ত অভিজ্ঞতার সারসত্তার অনুবন্ধ বা পারম্পর্য (correletion)। এদিকে দিয়ে তিনি হুসের্ল তথা অপরাপর অবভাস-বিজ্ঞানীগণের সঙ্গে একমত। যা হোক, শেলার-এর ব্যক্তির ধারনা অবভাস-বিজ্ঞানে এক নতুন সংযোজন। ব্যক্তি হলো সমস্ত ক্রিয়ার মূলকেন্দ্র এবং তাই সে কখনো বিষয় হতে পারে না। তাঁর মতে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এক অনতিক্রম্য বৈশাদৃশ্য রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীদের আছে পরিবেশ *(Umwelt)* আর কেবল মানুষেরই আছে জগৎ *(Welt)*। কারণ, মানুষ তার পরিবেশে মান বা মূল্য সংযোজন করে জগৎ সৃষ্টি করে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীরা এভাবে পরিবেশে মূল্য

সংযোজিত করতে পারে না। এখানেও হুসের্ল-এর সঙ্গে শেলার-এর সাদৃশ্য আছে।

যেসব দার্শনিক অবভাস-বিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রে প্রয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এড্ওয়ার্ড হার্টমান (Edward von Hartmann ঃ ১৮৪২-১৯০৬)। হার্টমান শেলার-এর চেয়ে বয়েসে অল্প বড় ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি দার্শনিক চিন্তা শুরু করেন। তাঁর প্রধান অবদান হলো শোপেনহাওয়ার-এর জীবনী-শক্তিবাদ (voluntarism) ও হেগেল-এর যুক্তিবাদকে (rationalism) নির্জ্ঞান স্তরের (Unconscious) ধারনার সাহায্যে অতিক্রম করা। তিন খন্ডে লেখা তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *Philosophy of the Unconscious*-এ তিনি নির্জ্ঞান স্তর সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক ভাবনা গ্রথিত করেন। তিনি বলেন যে বিশ্বজাগতিক, সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত দৈহিক প্রগতি — সবই নির্জ্ঞান স্তরের বিষয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যক্তির সচেতন ইচ্ছা-পূরনকেও (wishfulfilment) মেনে নিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন যে পারমার্থিক দিক দিয়ে বা ব্যক্তিগত এই সচেতন ইচ্ছা- পূরন অনন্ত-নির্জ্ঞান-ইচ্ছাপূরনের দ্বারা নিদ্ধারিত হয়ে থাকে। অনন্ত-নির্জ্ঞানের জন্যই মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আর ব্যক্তির সচেতন-ইচ্ছা-পুরন এর থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। এই হলো মানুষের পরিস্থিতি (human situation)। শোপেনহাওয়ার এবং হার্টমান-এর নির্জ্ঞানস্তরের ধারনাই আমরা পরে সিগ্মুন্ড ফ্রয়েড-এর (Sigmund Frend) মনঃ-সমীক্ষণে দেখতে পাই। হার্টমান বলেন, নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নৈতিক চেতনার প্রয়োগমূলক (empiral) উপাত্তগুলোর অনুসন্ধান করা। এই উপাত্তগুলোর অবভাস-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই নৈতিক আদর্শগুলো নিদ্ধারিন করতে হবে। স্মরণ করা যেতে পারে যে হার্টমানই সর্বপ্রথম 'মূল্য-বিজ্ঞান' (axiology) কথাটি ব্যবহার করেন। হার্টমান তাঁর নিরপেক্ষ (neutral) নির্জ্ঞানকে হেগেল-এর যুক্তিবাদী দর্শন এবং শোপেনহাওয়ারের অ-যুক্তিবাদী দর্শনের (irrationalism) উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে এই নিরপেক্ষ (neutral) নির্জ্ঞানেই ইচ্ছা (will) ও যুক্তি (rationality) সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। হার্টমান-এর সময়ে জীবনবাদ (vitalism) দার্শনিক জগতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলো। আর এর ফলে যুক্তিবাদ উপেক্ষিত হয়েছিল। হার্টমান এ-দুয়ের মধ্যে এক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ যুক্তিবাদকে দুরে রেখে এক নতুন জীবনবাদ প্রচার করেন। নীতির ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদকে এবং নৈরাশ্যবাদকে (pessimism) অগ্রাহ্য করেন এবং বিবর্তনবাদের ভিত্তির ওপর একপ্রকার সীমিত আশাবাদ (optimism) সমর্থন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো যুক্তিবিজ্ঞানের এবং উদ্দেশ্যবাদের অধীন। প্রকৃতিতে রয়েছে যুক্তিহীন ইচ্ছা (irrational will)। তবে বিবর্তনের মাধ্যমে এই যুক্তিহীন ইচ্ছা থেকেই যুক্তির উদ্ভব হয়। যুক্তির আবির্ভাব হলে সে যুক্তিহীন ইচ্ছাকে অধীনস্থ করতে চায়। যুক্তি প্রাকৃতিক জগৎ থেকে ভিন্ন এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করে, যেখানে অস্তিত্ব মানেই দুঃখ।

হার্টমান বলেন যে পরমসত্তার দুটো দিক আছে — একটি হলো যুক্তিহীন ইচ্ছা এবং অপরটি হলো পরম ধারনা (Idea)। শোপেনহাওয়ার-এর সঙ্গে একমত হয়ে তিনি বলেন যে পরমসত্তা যুক্তিধর্মী নয়। এখানে হেগেল থেকে তাঁর পার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, পরমসত্তা একদিকে যেমন যুক্তিহীন ইচ্ছা, অপর দিকে তেমনি যুক্তিপূর্ণ পরম ধারনা। তবে যুক্তিকে কখনোই যুক্তিহীন ইচ্ছার অধীনস্থ বলে ভাবা উচিৎ হবে না। কারণ যুক্তিহীন ইচ্ছাই যদি পরমসত্তা হতো তাহলে শোপেনহাওয়ার-এর জগৎ এমন যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হতো না। যুক্তিহীন ইচ্ছা কেবলমাত্র অস্তিত্বশীল — এই তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই অস্তিত্বের স্বরূপ কেমন হবে তা যুক্তিহীন ইচ্ছা নির্দ্ধারিন করতে পারে না। যুক্তিহীন ইচ্ছা এবং যুক্তি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। এদের একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল নয়। তবে হার্টমান বলেন যে এদুটো তৃতীয় কোন সত্তার দুটো বৈশিষ্ট্য (aspect) মাত্র। এই তৃতীয় সত্তা যুক্তিহীন ইচ্ছাও নয়, আবার বিশুদ্ধ যুক্তিও নয়। নির্জ্ঞান (Unconscious) থেকে অযৌক্তিক উদ্দেশ্যবিহীন ইচ্ছার (irrational, purposeless Will) জন্ম হয়। এই ইচ্ছার নির্দ্দেশেই জগতের আবির্ভাব, যেখানে যুক্তিপূর্ণ জাগতিক আকারসমূহ রয়েছে। যেহেতু নির্জ্ঞান থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, সেহেতু প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ের একপ্রকার সহানুভূতি রয়েছে। নির্জ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয় ভালোবাসার, সৌন্দর্যবোধের ও ধর্মীয় মরমী (mystic) অভিজ্ঞতাসমূহের। হার্টমান-এর এরূপ দর্শন অবশ্যই অবভাস-বিজ্ঞানমূলক। কারণ হার্টমান-এর দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান বিষয়গত মনোবিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। তাঁর চেতনা ও নির্জ্ঞান বিষয়ীগত নয়, বিষয়গত।

অবভাস-বিজ্ঞানে আরও একজন হার্টমান-এর অবদান অনস্বীকার্য। ইনি হলেন নিকোলাই হার্টমান (Nicolai Hartmann ঃ ১৮৮২-১৯৫০)। এই জার্মান দার্শনিক মার্বার্গ-এ (Marburg) শিক্ষা গ্রহণ কালে নব্য-কান্টবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরে তিনি হেগেলবাদী ও নব্য-হেগেলবাদী দর্শনেও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বার্লিনে তিনি অধ্যাপনা করতেন। তাঁর দর্শন যেমন ছিলো সমালোচনামুলক, তেমনি অবভাস-বিজ্ঞানধর্মী। তাঁর প্রধান প্রধান পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে *Outlines of a Metaphysic of Knowledge, Ethics* (৩ খন্ড), *Foundations of Ontology, The Structure of the Real World, New Ways of Ontology*, ইত্যাদি। হার্টমান হলেন একজন পুরোধা মহাদেশীয় (continental) নব্য-বস্তুবাদী এবং অবভাস-বিজ্ঞানী। তাঁর তিন খন্ডে প্রকাশিত *Ethics* গ্রন্থখানির মূল বক্তব্য হলো ঃ (ক) মূল্য বা মান (value) হলো সর্বব্যাপী (absolute), এবং (খ) এই সর্বব্যাপী মূল্য আমরা কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছাড়াই জানতে পারি। তিনি মনে করতেন যে মূল্য মূল্যবান বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং মূল্য আছে বলেই কোন বিষয় মূল্যবান হয়ে থাকে। কতকগুলো মূল্যবান

বিষয়ের অভিজ্ঞতা-পূর্ব (*a priori*) জ্ঞান বা ধারনা আছে বলেই কোন মূল্যবান বিষয় দেখে আমরা তার মূল্য বুঝতে পারি। মূল্যকে আমরা যুক্তির বা বুদ্ধির মাধ্যমে বুঝি না; মূল্য আমাদের সামনে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হার্টমান বলেন যে মূল্য যদি অপর বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হতো তাহলে এক অনবস্থাদোষ (fallacy of infinite regression) দেখা দিত।

হার্টমান-এর মতে মূল্যবান বিষয়ের অতিবর্তী সর্বব্যাপী মূল্য হলো অনন্ত সারসত্তা। এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়ের মান বা মূল্য নিদ্ধারিত হয়ে থাকে। নৈতিক ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কোন অনন্ত সর্বব্যাপী নৈতিক সারসত্তার ভিত্তিতেই আমরা নৈতিক বিচার করে থাকি। মূল্যের এই সর্বব্যাপী সারসত্তা হার্টমান-এর মতে 'যেন বাতাসে ভেসে থাকে'। কিন্তু এমন সারসত্তাকে কেমন করে বোঝা যাবে? হার্টমান বলেন যে এগুলোকে অভিজ্ঞতা ছাড়াই কেবলমাত্র স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যে বোঝা যায়। হার্টমান এখানে অজ্ঞেয়বাদীদের মতো বা মরমীবাদীদের মতো (like mystics) বক্তব্য রেখেছেন আর তাই তাঁর ভাষাও এখানে হয়ে পড়েছে ধোঁয়াটে। তিনি বলেন, নৈতিক অনন্ত সর্বব্যাপী সারসত্তাগুলো হলো বিবেকের বাণী। এগুলো স্বতঃস্ফুর্তভাবে আমাদের সামনে এসে হাজির হয় আবেগ-মিশ্রিত হয়ে। এই সারসত্তাগুলো যেন এক আদর্শ জগতের বিষয় আর এগুলোই আমদের নৈতিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

নৃতাত্ত্বিক অবভাস-বিজ্ঞানীগণের মধ্যে আর একজন হলেন মরিস মার্লু-পন্টি (Maurice Merleau-Ponty) (১৯০৮-১৯৩৬)। এঁর জীবনী আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখতে পাবো। গেষ্টাল্ট বা সমগ্রতাবাদী (Gestalt) মনোবিজ্ঞানী ও হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি প্রভূত প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি বাস্তব জগৎ-কে অনুধাবন করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ চেতনা ও নৈতিকতার ওপর গবেষণা করেছিলেন। তাঁর *The Structure of Behaviour* এবং *Phenomenology of Perception* নামক পুস্তকদ্বয়ে তিনি চেতনা ও জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে তিনি দেহ ও মন, অথবা বস্তু ও চেতনার দ্বৈততাকে (duality) অস্বীকার করেছেন। তেমনিভাবে প্রান্তিক (extreme) বস্তুবাদ ও প্রান্তিক বিষয়ীবাদকেও (subjectivism) তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে বিষয় বা বস্তু পুরোপুরি প্রদত্ত-ও ('given') নয় আবার পুরোপুরি বিষয়ীর দ্বারা সৃষ্টও নয়। তিনি বলেছেন যে বিষয় হলো স্বভাবতঃ অবর্ণনীয় এবং প্রহেলিকাময় (enigmatic)। অথচ তিনি আবার বলেছেন যে বিষয়কে জানা যেতে পারে। এজন্যই তাঁর দর্শনকে 'দ্ব্যার্থবোধক দর্শন' অথবা 'অস্পষ্ট দর্শন' (philosophy of ambiguity) বলা হয়েছে। মার্লু-পন্টি মনে করতেন যে প্রত্যক্ষ-বিষয়ক অবভাস-বিজ্ঞানের সাহায্যে বাস্তব জগৎ-কে অনুধাবন করা যেতে পারে। দেকার্তের দ্বৈতবাদকে (dualism) অস্বীকার করে তিনি দেহ ও

মনের সম্পর্কের সমস্যাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন — শারীরীক স্তর, জৈবিক স্তর ও মানসিক স্তর। সর্বনিম্নস্তরকে বলেছেন শারীরীক স্তর (physical level) এবং সর্বোচ্চ স্তরকে বলেছেন মানসিক স্তর। প্রতিটি নিম্নবর্তী স্তর থেকেই পরবর্তী উচ্চতর স্তরের উৎপত্তি ঘটে, তবে প্রতিটি স্তর পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। মার্লু-পন্টি শুদ্ধ চেতনাকে দেহ থেকে পৃথক করে না দেখে অবভাস-বৈজ্ঞানিক অভিপ্রায়ের (intentionality) দেহের মধ্যেও দেখেছেন। এভাবে বিষয়টিকে দেখলে অবশ্যই বলতে হবে যে যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি একটি বিশেষ দেহের অধিকারী সেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির অভিপ্রায় অবশ্যই ভিন্ন হবে, এবং প্রতিটি ব্যক্তির চেতনা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়কে প্রত্যক্ষণ করবে। কারণ, প্রতিটি ব্যক্তির দেহ যেমন একটি বিশেষ উত্তরাধিকার (heredity) নিয়ে উপজাত হয়েছে, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তির চেতনাও একটি বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, আমরা কখনোই কোন বিষয়ের সার্বজনীয় প্রত্যক্ষণের কথা বলতে পারবো না। বিশেষ ব্যক্তির এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আংশিক কারণ হলো ব্যক্তির পূর্ব-নির্ধারিত অর্থপ্রকরণ (meaning context)। সে তাঁর বিশেষ অর্থ-প্রকরণের (পূর্ব-নির্ধারিত) পরিধির বাইরে গিয়ে বিষয়কে প্রত্যক্ষণ করতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রতিটি ব্যক্তি একটি বিশেষ সীমারেখার মধ্যে প্রত্যক্ষণ করে থাকে। আবার একই সঙ্গে সে সৃজনশীলও বটে। সে শুধু পূর্ব-নির্ধারিত অর্থের অধীন নয়, তার মধ্যে নতুন মাত্রাও সে সংযোজন করতে পারে।

মার্লু-পন্টি বলেন, ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সীমারেখাকে কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে অতিক্রম করা যেতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী সীমিত বটে, কিন্তু ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে অপর ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারে। এভাবে তার সীমিততত্ব দূর করা যায়। মার্লু-পন্টি আরও বলেন যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রত্যক্ষকে নান্দনিক পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর প্রখর এবং গভীরতর করতে পারে। তিনি বলেন যে প্রত্যক্ষের মধ্যে রয়েছে সম্পর্ক ও সম্পর্কগত আকার। তার ফলে এক বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের অনুভূতিমূলক বা ধারণামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। যা হোক, পঞ্চম অধ্যায়ে মার্লু-পন্টি সম্পর্কে আমরা আরও কিছুটা আলোচনা করবো।

মনোবৈজ্ঞানিক অবভাস-বিজ্ঞান

মনোবৈজ্ঞানিক বিষয়ে অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন আলেকজ্যান্ডার ফ্রান্ডার (Alexander Pfänder ঃ ১৮৭০-১৯৪১)। এই জার্মান দার্শনিক মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনা করতেন। দার্শনিক মনোবিজ্ঞানী থিয়োডোর লিপ্স (Theopdor Lipps) এবং হুসের্ল-এর মতে দর্শন তথা যুক্তি-বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, এমনকিজ্ঞানতত্ত্ব প্রধানতঃ মনোবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। নন্দন-বিজ্ঞানে (aesthetics)

তাঁর প্রধান বক্তব্য হলো এই যে নান্দনিক বিষয়গুলোর বিশেষ এক প্রকারের অতিবর্তী 'জীবন' আছে। আমরা যদি এই অতিবর্তী 'জীবনে' প্রবেশ করতে পারি, তবে আমরা ঐ নান্দনিক বিষয়ের সঙ্গে এক প্রকার সম-অনুভূতি (empathy অথবা *Einfühlung*) অনুভব করতে পারবো। যাহোক, ফ্যাণ্ডারের প্রধান প্রধান রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে *Phenomenology of the Will, The Soul of Man,* এবং *Philosophy of Life Goals.* ফ্যান্ডার এক স্বাধীন অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি একপ্রকার অবভাস-বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিজ্ঞানও প্রবর্তন করেন। এরূপ যুক্তি-বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি হলো আদর্শমূলক উপ-অস্তিত্বশীল (subsistent) বিষয়।

অবভাস-বৈজ্ঞানিক সমাজ-বিজ্ঞান

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবভাস-বিজ্ঞান এক উর্ব্বর ভূমি পেয়েছে। টমাস লুকমান (Thomas Luckmann) তাঁর *Phenomenology and Sociology* নামক পুস্তকের ভূমিকায় বলেছেন যে অবভাস-বিজ্ঞান উত্তরোত্তর সমাজ-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, অবভাস-বিজ্ঞান আমাদের প্রাত্যহিকঅভিজ্ঞতার বিষয়গুলোর অস্তিত্বমূলক প্রশ্নবলীকে বন্ধনীযুক্ত করে এই অস্তিত্বমূলক প্রশ্নগুলোর উৎস খুঁজতে প্রচেষ্টা চালায়। অভিজ্ঞতার অনেকাংশেই রয়েছে গৃহীত (accepted) কিছু অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারনা যেগুলোকে আমরা সাধারনতঃ বিচারমূলক পরীক্ষা করে দেখিনা। যেমন, আমরা অনেকসময় বলে থাকি যে গণতন্ত্রই রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিৎ। গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের বিশেষ একটি ধারনা রয়েছে অবশ্যই, কিন্তু এই ধারনা যথেষ্ট অস্পষ্ট। গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে এ-সম্পর্কে আমাদের যে প্রথাগত ধারনা রয়েছে তাকে বন্ধনীযুক্ত করে তবে তাকে বুঝতে হবে। অবভাস-বিজ্ঞানে আমরা বিষয়ীর চেতনাকে বিশ্লেষণ করে কোন বিষয় বিষয়ীর চেতনায় কীভাবে উৎপন্ন হয় তা দেখবার চেষ্টা করি। অমারা বিষয়ের মূল ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যাবলী জানতে আগ্রহী, গৃহীত বৈশিষ্ট্যাবলীতে নয়। গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধারনা আছে। আমরা এসব নানা ধরনের ধারনার সারসত্তাকে জানতে চেষ্টা করবো যা সবার চেতনায় একই ভাবে উপস্থিত আছে। আমরা আরও দেখবো, কেমন করে আমাদের চেতনায় গণতন্ত্র নামক বিষটির সারসত্তা এসে উপস্থিত হয়। আমরা দেখবো, 'গণতন্ত্র' কথাটির দ্বারা আমরা মূলতঃ কী বোঝাতে চাইছি, অথবা 'গণতন্ত্র' পদটির ব্যবহারের পশ্চাতে আমাদের কী অভিপ্রায় রয়েছে। এই অভিপ্রায়কে জানাই হবে 'গণতন্ত্র' পদটির পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি। আর অবভাস-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও প্রধানতঃ তা-ই।

যা হোক, অবভাস-বৈজ্ঞানিক সমাজ-বিজ্ঞানের (phenomenological sociology) মতে ঐতিহাসিক ও সামাজিক জ্ঞান আপেক্ষিক (relativistic) নয়, বরং পরিপ্রেক্ষিতগত (perspectivistic) সম্পর্কগত (relational)। এরূপ কথা বলেছন কার্ল ম্যানহেম

(Karl Manheim)। প্রকৃত অর্থে তিনি একজন অবভাস-বৈজ্ঞানিক না হলেও তাঁর কিছু কিছু বক্তব্য অবভাস-বিজ্ঞানের চিন্তাধারাকে সমর্থন করেছে। ম্যানহেম বলেছেন যে এমনকি ভৌতিকবিষয় সম্পর্কে আমাদের যে ধারনা তা-ও ব্যাখ্যাকারী বিষয়ীর অবস্থান-বিন্দুর ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেছেন, ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো যে আপতঃ পরস্পর-বিরোধী মতগুলো প্রকৃতপক্ষে পরস্পর বিরোধাত্মক নয়, বরং ঐ-সব মতামত বিশেষ একটি ঐতিহাসিকবিষয়ের সারসত্তাকে ঘিরে রয়েছে। ঐতিহাসিক বিষয়ের এই সারসত্তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভিন্ন গভীরতার স্তর থেকে দেখলে ভিন্ন ভিন্ন মতামত উপস্থিত হতে বাধ্য।

ধর্ম ও অবভাস-বিজ্ঞান

পীটার কোয়েস্টেনবাউম (Peter Koestenbaum) বলেছেন যে ধর্ম-দর্শনে অবভাস-বিজ্ঞানের অবাধগতি রয়েছে। তিনি বলেন, অবভাস-বিজ্ঞান ধর্মীয় অনুভূতির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবভাস-বিজ্ঞান যেরূপ বর্ণনা দিয়ে থাকে, ধর্মের ক্ষেত্রে সেরূপ বর্ণনা করে না। ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট (ambiguous) অংশের বর্ণনা করা হয়। যেমন, অপরাধবোধ অথবা অত্যানন্দের (euphoria) অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা হয়। এরূপ বিভিন্ন ধর্মীয় অস্পষ্ট ক্ষেত্রগুলোর বর্ণনার সাহায্যে ধর্মবোধকে বোঝা যায় এবং মানুষের জীবনে ধর্মের স্থানকে অনুধাবন করা যায়। অবভাস-বৈজ্ঞানিক অনুধাবনের ফলে প্রথাগত বা চিরাচরিত ধর্ম-সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারনাগুলোর পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ফলে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মীয় বচনগুলো এবং বিশ্বাসগুলো আমরা পেয়ে থাকি, সেগুলোর সতর্ক অনুধাবনই ধর্মের ক্ষেত্রে অবভাস-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের দুটো বিশেষ সুবিধা রয়েছে। প্রথমঃ এর দ্বারা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব; এবং দ্বিতীয়তঃ, এরূপ বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ ধর্ম-সম্পর্কে যে জ্ঞান আমাদের হবে তা অবশ্যই যৌক্তিক ও প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বের প্রতিপাদনের চেয়ে অধিকতর যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য হবে। অবভাস-বিজ্ঞানের মতে অন্যান্য সব বিষয় থেকে মানুষ সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন। মানুষকে এক টুকরো পাথরের মতো অনুধাবন করা চলেনা। জীববিদ যেমন একটি জীবন্ত প্রজাপতিকে বুঝতে চেষ্টা করেন, ঠিক তেমনভাবে মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ অবভাস-বিজ্ঞানে মানুষকে এবং অন্যান্য বিষয়কে স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যে বুঝতে হবে।

ধর্মের ক্ষেত্রে অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেমন হবে? "ধর্মকে অনুধাবন করার সময় আমরা আত্মা, দেহ, জগৎ, সৃষ্টিকর্তা, ধর্মীয় আবেগ, যুক্তি ইত্যাদির মধ্যে কোনরূপ তীক্ষ্ণ পার্থক্য করবো না। আমরা বরং লক্ষ্য করবো কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঈশ্বর, বিশ্বাস, প্রার্থনা, অমরত্ব, পূর্ণতা, মোক্ষ এবং এমনসব বিষয়ের ধারনা

সম্পর্কযুক্ত।" কোয়েস্টেনবাউম বলেন যে ধর্ম-সম্পর্কে দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক এবং যুক্তি-বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং অবভাস-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আধিবিদ্যক ঈশ্বর এবং ধর্মের ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ-থেকে অন্ততঃ কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে যে অবভাস-বৈজ্ঞানিক বিষয় এবং অন্যান্য বিদ্যার (subjects) বিষয়ের মধ্যেও যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য রয়েছে। কোয়েস্টেনবাউম বলেন যে আধিবিদ্যক ঈশ্বর যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জগতের পরিবর্তনশীলতাকে ব্যাখ্যা করতে হলে একটি মূল শক্তির প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, টমাস এ্যাকুইনাস-এর (Thomas Aquinas) ঈশ্বর এমনি এক মূল শক্তি। এমন ঈশ্বরকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি না, পূজো করতে পারি না, অথবা তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে পারি না। পক্ষান্তরে, যে ঈশ্বরের কাছে আমরা আত্ম-সমর্পন করি, প্রার্থনা জানাই, সে ঈশ্বরকে আমরা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করি না। সে ঈশ্বরকে পাই আমরা গভীর ও তীব্র অনুভূতির সাহায্য। আধিবিদ্যক ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের অর্থবোধের, পূর্ণতার, মৃত্যুর অথবা মোক্ষের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অথবা তীব্র অনুভূতির মাধ্যমে যে ঈশ্বরকে আমরা পাই, তিনি হলেন এসবের উৎস এবং মূলভিত্তি।

অবভাস-বিজ্ঞান ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখা

অধুনা অবভাস-বিজ্ঞানের প্রভাব শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান বা ধর্ম-তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই — সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, শিল্পকলা, আইনশাস্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে এর প্রভাব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবভাস-বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে বিশেষ করে অস্তিত্ববাদের মাধ্যমে। অস্তিত্ববাদের ছত্রছায়ায় এক নতুন সাহিত্যের আকার দেখা দিয়েছে। আবার সাহিত্যে অবভাস-বিজ্ঞানের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেও পড়েছে। রাশিয়ার দার্শনিক ওয়াই. দভিদোভ (Y. Davidov) সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন মার্সেল (Marcel), সার্ত্র (Sartre) এবং সিমোঁ দ বুভার-এর (Simon d Bouvoir) সাহিত্যিক রচনার মধ্যে অবভাস-বিজ্ঞানের প্রভাব। এছাড়া তিনি রাশিয়ার (ভূতপূর্ব) আইভাশেভা (Ivasheva) এবং কলিন উইলসনের (Colin Wi!son) উপন্যাসের মধ্যেও অবভাস-বিজ্ঞানের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। এমনিভাবে আমরা দেখতে পাই যে সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রকলায়, এমনকি আইনশাস্ত্রেও অবভাস-বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে।

অবভাস-বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা

আশ্চর্যের বিষয় এই যে হুসের্ল-এর এবং সাধারণ অবভাস-বিজ্ঞানের অশেষ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আজও পৃথিবীর সবদেশে একে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয়নি। জার্মান ভাষায় হুসের্ল তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ *Ideen* ১৯০০-এ প্রকাশ করলেন, আর প্রায় ১৩ বছর পর এই গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হলো। অবশ্য এর পর তাঁর অন্যান্য পুস্তকও

ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ইংলণ্ডে হুসের্ল-এর দর্শনকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়নি। ১৯১০-এ প্রকাশিত বার্ট্রান্ড রাসেল-এর (Bertrand Russell) *Philosophical Essays* নামক পুস্তকে হুসের্ল-এর দর্শনের উল্লেখ পর্যন্ত দেখা যায় না। এমনকি ১৯৪৬-এ প্রকাশিত তাঁর *History of Western Philosophy* নামব পুস্তকেও তিনি হুসের্ল-এর দর্শনের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। এই পুস্তকে তিনি জন্ ডিউই-এর (John Dewey) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অথচ ডিউই-এর পূর্ববর্তী দার্শনিক হুসের্ল তাঁর লেখায় স্থান পাননি। আবার রাসেল-এর সমসাময়িক আলফ্রেড নর্থ হুয়াইটহেড-ও (Alfred North Whitehead) তাঁর লেখায় অবভাস-বিজ্ঞানের কোন কথাই উল্লেখ করেননি। শুধু এই নয়, এই সেদিন অবধি ইংলণ্ডে অবভাস-বিজ্ঞানের কোনস্থানই বলতে গেলে ছিলো না। তবে বর্তমানে ইংলণ্ডের দার্শনিক চিন্তার জগতে অবভাস-বিজ্ঞানের প্রভাব কিছুটা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ফ্রান্সের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে জাঁ-পল সার্ত্র (Jean-Paul Sartre) সর্বপ্রথম বিদ্বজ্জনের সম্মুখে অবভাস-বিজ্ঞানকে নিপুনতার সঙ্গেঁ তুলে ধরেন। তবে অনতিকাল পরেই তিনি অবভাস-বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে অস্তিত্ববাদ বা অস্তিবাদের (existentialism) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু মার্লো-পঁতি (Marleau-Ponty) অবভাস-বিজ্ঞানকে সাগ্রহে ধরে রাখেন এবং অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ *Phenomenology of Perception*-এ তিনি প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দক্ষতার সঙ্গেঁ প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া আরও কিছু ফরাসী দার্শনিক অবভাস-বিজ্ঞানকে দার্শনিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনিভাবে ফরাসী দার্শনিক বাতাবরনে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে অবভাস-বিজ্ঞান কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়া (প্রাক্তন) এবং অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলোতেও অবভাস-বিজ্ঞান প্রবেশাধিকার পায়নি বললেই চলে। এর কারণ হয়তো এই যে কম্যুনিষ্ট দেশগুলো কম্যুনিজমএর পরিপন্থী কোন দার্শনিক মতবাদের কথাই শুনতে আগ্রহী নয়। এতদসত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়ার (প্রাক্তন) কিছু কিছু দার্শনিক অভবাস-বিজ্ঞানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং এর সমালোচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভি. এ. লেক্টরস্কি (V. A. Lektorsky) তাঁর *Subject Object Cognition* নামক পুস্তকে অবভাস-বিজ্ঞানের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবভাস-বিজ্ঞানের আলোচনা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে। তবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে এর আলোচনা এবং গবেষণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফুলার-এর মতে ইউরোপ এবং আমেরিকার দার্শনিক চিন্তার জগতে অবভাস-বিজ্ঞান ধীরে ধীরে স্থানকরে নিয়েছে। বোরিং (Boring) বলেন যে ১৯৫০ অবধি অষ্ট্রিয়া এবং দক্ষিণ জার্মানীতেই অবভাস-

বিজ্ঞানের পীঠস্থান ছিলো। এই দুটি কেন্দ্র থেকে অবভাস-বিজ্ঞান ক্রমশঃ উত্তর জার্মানী ও প্রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। অবভাস-বিজ্ঞানের অনুকূল যে মুক্ত-চিন্তার বাতাবরনের প্রয়োজন তা কেবল ভিয়েনা, প্রাগ, গ্রাৎস এবং মিউনিকেই অধিকতর লক্ষ্য করা গেছে।

ভারতবর্ষেও ইদানীং কালে অবভাস বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে। একই কথা বলা চলে অবভাস-বিজ্ঞানের দুহিতৃ অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে। কিন্তু বর্তমানে ফ্রান্সে এর যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও বিশ্বের অন্যত্র এর প্রভাব কম পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিকন্তু মেরী ওয়ার্নক (Mary Warnock) বলেছেন, অস্তিত্ববাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তাঁর মতে দর্শনকে বাঁচতে হলে অস্তিত্ববাদের বা অস্তিবাদের অবৈজ্ঞানিক পথ ছাড়তে হবে। কিন্তু একথা ঠিক যে বিবিক্ত মানুষের আধুনিক সমাজে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা কখনোই লোপ পেতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সাহিত্যে, দর্শনে, চিত্রকলায় অস্তিত্ববাদের অনুরনন আজও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই অস্তিত্ববাদ নিয়েই আলোচনা করবো।

অবভাস-বিজ্ঞান থেকে অস্তিত্ববাদ

'অস্তিত্ববাদ' কথাটি বর্তমানে এত বেশী প্রচলিত যে জাঁ-পল্ সার্ত্র তাঁর বই *Existentialism and Humanism*-এ বলেছেন যে এই পদটিকে মানুষ এখন ইচ্ছে মতো ব্যবহার করছে। অধুনা বিশেষ করে ফ্রান্সে অস্তিত্ববাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে, এ আমরা পূর্বে দেখেছি। এর পশ্চাতে রয়েছে বিখ্যাত সাহিত্যিক-দার্শনিক সার্ত্র-এর অবদান। অস্তিত্ববাদের কথা ঊনবিংশ শতাব্দিতে ডেনমার্কের দার্শনিক সোরেস কিয়ার্কেগার্ড (Sören Kierkegaard) সর্বপ্রথম বললেও, বিংশশতাব্দিতে সার্ত্রই এর প্রচার করেছেন সবচেয়ে বেশী। সার্ত্র-এর সমস্ত সাহিত্যিক বচনার মধ্যেই অস্তিত্ববাদের প্রভাব আছে, অথবা বলা যায় যে সার্ত্র-এর সব সাহিত্যিক রচনাই অস্তিত্ববাদমূলক। সার্ত্র ছিলেন একজন প্রকৃত অস্তিত্ববাদী লেখক। তাঁর লেখা জীবনমুখী এবং মানবতা-কেন্দ্রিক। এদিকে দিয়ে রুডল্ফ ইউকেন-এর সঙ্গে সার্ত্র-এর যথেষ্ট মিল আছে। ইউকেন-ও বলেছিলেন যে দর্শন হবে জীবন-মুখী। উভয়ই ছিলেন মানবতাবাদী (humanist) আর উভয়ের মতেই জীবন-যাত্রা এবং দার্শনিক চিন্তারর মধ্যে কোন প্রাচীর নেই। সার্ত্র ইউকেন-এর চেয়ে বয়েসে ছোট ছিলেন (ইউকেন ঃ ১৮৪৬-১৯২৬, আর সার্ত্র ঃ১৯০৫-১৯১৯)। দুজনেই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে দুজনের মধ্যে কিছুটা মিল থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে সার্ত্র ইউকেন-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সার্ত্র প্রধানতঃ হুসের্ল-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা তাঁর নিজস্ব। ফ্রান্সে অস্তিত্ববাদের প্রচার সাত্র-ই করেছিলেন। যা হোক, বর্তমানে শুধু ফ্রান্সে নয়, বিশ্বের সর্বত্র অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা সাহিত্যে, চিত্রকলায়, রাজনীতিতে এবং জ্ঞানের অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অস্তিত্ববাদের উৎস কোথায়? — এরূপ প্রশ্ন হলে অবিলম্বে উত্তর দেয়া দুরূহ। চট্‌পট্ বলে দেয়া যেতে পারে যে অস্তিত্ববাদের উৎস হলো অবভাস-বিজ্ঞান, কেননা প্রধান প্রধান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হুসের্ল-এর উত্তরসূরী এবং এঁরা হুসের্ল-এর দ্বারা প্রথম দিকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু অস্তিত্ববাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা হুসের্ল-এর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মধ্যেও দেখতে পাই। কিয়ার্কেগার্ড-ও (১৮১৩-১৮৫৫) একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অবভাস-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তবে একথা ঠিক যে কিয়ার্কেগার্ড-এর পরবর্তী অস্তিত্ববাদ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে অবশ্যই অবভাস-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এর কারন এই যে অবভাস-বিজ্ঞান এবং অস্তিত্ববাদ উভয়ের আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্র-বিন্দুতে রয়েছে চেতনার বিশ্লেষণ। চেতনার স্বরূপ জানাই হলো অবভাস-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর চেতনার স্বরূপ খুঁজতে গিয়েই অস্তিত্ববাদীগণ দেখেছেন যে চেতনা এরূপ একটি

বিষয় যার কোন সারসত্তা নেই, আছে শুধু অস্তিত্ব (existence)। কোন বিষয় আছে, অর্থাৎ কোন বিষয়ের অস্তিত্ব আছে — একথা বলা যত সহজ, ঐ বিষয়ের সারসত্তা কী তা বলা তত সহজ নয়। বিশেষকরে বিষয়টি যদি 'চেতনা' হয় তাহলে তার সারসত্তা জানা হয়তো কখনোই সম্ভব নয়। আমরা শুধু বলতে পারি যে চেতনার অস্তিত্ব আছে। চেতনা বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঃ বস্তু পূর্ণ, গঠিত (complete অথবা finished), কিন্তু চেতনা অপূর্ণ। অথবা বলা যায় যে চেতনা শূণ্য (nothing)। কাজেই আমরা কেবলমাত্র নিশ্চিত যে চেতনার অস্তিত্ব আছে।

অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, অস্তিত্ববাদ সারসত্তায় আগ্রহী নয়। বস্তুর সারসত্তা কী অথবা চেতনার সারসত্তা কী — এ নিয়ে অস্তিত্ববাদ আলোচনা করে না। অস্তিত্ববাদ কেবলমাত্র বিষয়ের অস্তিত্বের স্বরূপ জানতে চায়। এদিক দিয়ে অবভাস-বিজ্ঞান থেকে অস্তিত্ববাদের দূরত্ব অনেক। কারণ, অবভাস-বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো সারসত্তাকে অনুধাবন করা। আর তাছাড়া, অবভাস-বিজ্ঞানে বিষয়ের অস্তিত্বের কথাটি বা প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সার্ত্র এজন্য অবভাস-বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে সারসত্তার কথা ভাবা যায় না, কারণ মানুষ কখনোই তৈরী বিষয় (finished product) নয়। মানুষের মধ্যে রয়েছে অপূর্ণতা; সে সর্বক্ষণ নিজেকে তৈরী করে চলেছে। মানুষের সামনে কোন লক্ষ্য বা প্রকল্প (project) রয়েছে। সে এমন হবে অথবা তেমন হবে— নিজেকে এমন করে তৈরী করবে অথবা তেমন করে তৈরী করবে — এমন ভাবনা এবং এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তৎপরতা রয়েছে তার সর্বক্ষণ। একটি বিশেষ মুহূর্তে কোন ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা হয় 'তুমি কে?' অথবা 'তুমি কী' (প্রশ্নটি বর্তমান কালের), তাহলে সে ঠিক সেই মুহূর্তে তার নিজের বর্ণনা দিতে পারবে না। সে শুধু অতীতে কী ছিল এবং ভবিষ্যতে কী হতে চায় তা বলতে পারে। কিন্তু হয়তো পরমুহূর্তেই তার এসব কথা পাল্টে যাবে পরিস্থিতির (situation) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ পরমুহূর্তেই হয়তো সে পূর্বের প্রকল্প ত্যাগ করে অন্য এক প্রকল্পের কথা বলবে। এমন অবস্থায় আমরা কি বলতে পারি যে ঐ ব্যক্তির সারসত্তা আছে? অস্তিত্ববাদের মতে তাই মানুষ শুধু বলতে পারে যে সে কেবল বেঁচে আছে, অথবা তার কেবল অস্তিত্ব আছে। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, অস্তিত্ববাদ জীবন-কেন্দ্রিক। দর্শনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জ্ঞানান্বেষণ হবে না, হবে জীবনের পথ-নির্দেশ। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি মানুষের যে পরিস্থিতি তা তুলে ধরা অস্তিত্ববাদের একটি প্রধান লক্ষ্য। মানুষ পৃথিবীতে আসে তার স্বীয় ইচ্ছানুসারে নয়। আবার এসেই সে দেখতে পায় কতকগুলো পূর্ব-নির্ধারিত রীতি-নীতি, আদর্শ,

দর্শন ইত্যাদি। এগুলোকে সে হয় চোখবুজে গ্রহণ করতে পারে অথবা এগুলোর যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন তুললেই সে বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। কোন্ বিষয়ের পরিপেক্ষিতে সে এসবের বিচার করবে? কোন্ নির্ণায়কের সাহায্যে সে এসব রীতি-নীতি, আদর্শ, দর্শন ইত্যাদির যাথ্যার্থ বিচার করবে? সব পরিপ্রেক্ষিতই তো আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ বা সর্বব্যাপী (absolute) পরিপ্রেক্ষিত কোথায় পাবে সে? আর নিরপেক্ষ বা সর্বব্যাপী দৃঢ় কোন ভিত্তি না থাকলে সবকিছুর বিচার করবে কী করে? তার হাতে তো কোন মান-কাঠি নেই, কোন নির্ণায়ক নেই, — তাহলে তার জীবন-দর্শন সে গঠন করবে কেমন করে? তাছাড়া আরও এক বিরাট সমস্যা রয়েছে — তাকে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, তার জীবনের অবসান হবে। কিন্তু কার বিধানে তার জীবনের যবনিকা টানা হবে? কেন হবে? যবনিকা পতনের পর তার গতি কী হবে? এসব প্রশ্ন তার জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলে সে তার জীবন-দর্শন গঠন করতে পারে না। অথচ এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর সে কোনদিনও পাবে না, আর না পেলে তার জীবন-দর্শন গঠন করা সম্ভব নয়। কিন্তু জীবন-দর্শন ভিন্ন সে এক পা-ও এগুতে পারে না। সে কী করবে? সে বিভ্রান্ত। অস্তিত্ববাদ মানব-জীবনের এরূপ বিভ্রান্তকর পরিস্থিতিকেও তুলে ধরবার চেষ্টা করে।

তৃতীয়ত, অন্যান্য দর্শন যতখানি যুক্তিবাদী, অস্তিত্ববাদ ততখানি যুক্তিবাদী নয়। দর্শন যুক্তবাদী হবে না অথবা কম যুক্তিবাদী হবে — এ কেমন কথা? কিন্তু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে এমনকি অত্যন্ত যুক্তিবাদী দার্শনিক কান্ট-ও তাঁর *Prolegomena to Any Future Metaphysics*-এ যুক্তির ব্যর্থতা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা হয়েতো অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তিনি বলেছিলেন, যুক্তি কেবলমাত্র সংবেদনের জগতেই সার্থক হতে পারে। অতিবর্তী জগতে যুক্তির কোন স্থান নেই। কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র সংবেদন-জগতের অধিবাসী নয়, অতিবর্তী-জগতেরও বটে। তাই কেবলমাত্র যুক্তিতে তার পূর্ণ-দর্শন মেলে না। মানুষ শুধুমাত্র সংবেদনশীল জীবই নয়, আবেগ-প্রবণ জীবও বটে। অস্তিত্ববাদী দর্শন এই আবেগকে উপেক্ষা করেনি। অস্তিত্ববাদী যুক্তি-বিরুদ্ধ বা অযৌক্তিক (irretional) চিন্তাধারা আমরা বৈজ্ঞানিক ও অস্তিত্ববাদী দার্শনিক লুই পাসকেল-এর (Louis Pascal) মধ্যেও দেখতে পাই। পাসকেল মানুষের পরিস্থিতিকে অদ্ভুত বলেছেন, আর মানুষকে তিনি এক অভিনব, দ্বন্দ্বভিত্তিক দ্বৈত সত্তা বা দ্বিত্ব বলেছেন ("What a chimera then is man! What a novelty! What a monster, what chaos, what a contradiction, what a prodigy!")। মানবজীবনের এই অন্ধকার দিকটি তুলে ধরে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক। অনেক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক এমন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ নৈরাশ্যের কাছে আত্ম-সমর্পন করেছেন।

চতুর্থত, এতদসত্ত্বেও বলতে হবে যে অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যবহারিক (practical) দর্শন। শুধু নীরস জ্ঞানের কথা নয়, জীবনের পথে কেমন করে চলতে হবে, কেমন করে মুক্ত হবে মানুষ জীবন-যন্ত্রনা থেকে, ত্রিতাপ থেকে, তা নির্ধারন করাই হবে দার্শনিক চিন্তার মূল লক্ষ্য। মোটকথা, মানুষের মুক্তির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে যেসব দার্শনিক চিন্তাধারা সেগুলোর পুরোধা হলো অস্তিত্ববাদ। তবে অস্তিত্ববাদ বলে কোন বিশেষ এক শ্রেণীর দার্শনিক লেখক নেই অথবা অস্তিত্বমূলক লেখা বলে কোন লেখাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না। কেউ কেউ অস্তিত্ববাদের কথা বললেও নিজেকে অস্তিত্ববাদী মনে করেন নি, আবার কোন কোন দার্শনিক নিজেকে অস্তিত্ববাদী বলে ঘোষনা করলেও তাদের লেখাতে অস্তিত্ববাদের চিহ্নগুলো না-ও মিলতে পারে। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ এই দশকে একশ্রেণীর দার্শনিক ব্যষ্টি মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন গভীরভাবে এবং এঁদের মতে দার্শনিক আলোচনার বিষয় হওয়া উচিৎ জীবন-জগতের (life-world অথবা *Lebenswelt*) মাঝখানে বিবিক্ত মানুষের জীবন-যন্ত্রনা এবং তা থেকে তার মুক্তি। এঁদেরকেই আমরা সাধারনতঃ অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বলে চিহ্নিত করে থাকি। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অস্তিত্ববাদী দর্শন ও অনস্তিত্ববাদী দর্শনের মধ্য অনতিক্রম্য কোন প্রাচীর নেই।

পঞ্চমত, অস্তিত্ববাদী দর্শন নীতি-বৈজ্ঞানিক বা নীতিবিদ্যক বাস্তব জীবনের প্রথাগত সব আদেশ-নিষেধকে অন্ধের মতো গ্রহন না করে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এক নতুন নীতি-বিদ্যা গঠন করতে আগ্রহী।

ষষ্ঠত, অস্তিত্ববাদী দর্শন হলো মানবতাবাদী। সার্ত্র তাঁর *Existentialism and Humanism*-এ অস্তিত্ববাদের এই দিকটি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন।

সোরেন কিয়ার্কেগার্ড

'অস্তিত্ববাদ' কথাটির সঙ্গে সার্ত্র-এর নাম এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে অস্তিত্ববাদ বললেই আমাদের সার্ত্র-এ নাম মনে পড়ে। আবার সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদ হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞান থেকে এসেছে। তথাপি আমরা দেখবো যে হুসের্ল-এর অনেক পূর্বেই দর্শনের ইতিহাসে অস্তিত্ববাদ দেখা দিয়েছে, সার্ত্র-এর পূর্বে তো বটেই। প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার সূচনা হয় সোরেন কিয়ার্কেগার্ড (Sören Kierkegaard) থেকে। ১৮১৩-এ দার্শনিক-ধর্মজাজক কিয়াকেগার্ড-এর জন্ম হয় ডেনমার্কের কোপেন হেগেন শহরে। কোপেন হেগেন বিশ্ববিদ্যায়ে ধর্মবিদ্যা পড়তে গেলেও তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন সাহিত্যে ও দর্শনে। এ-সময়ে ডেনমার্কে হেগেলীয় দর্শনের প্রভাব ছিলো প্রচন্ড। কোপেন হেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পড়তে যান বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিয়ার্কেগার্ড শারীরীক দিক দিয়ে ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। বিশিষ্ট খৃষ্টান

পরিবারে তিনি বেড়ে ওঠেন এবং এর ফলে তাঁর সমস্ত লেখায় খৃষ্ট-ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম থেকেই তিনি একপ্রকার মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। এর সঙ্গে আবেগ ছিলো তাঁর প্রচন্ড। একটি ঘটনার সাহায্যে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বকে বোঝানো যেতে পারে। তাঁর শারীরীক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও রেজীনা অল্সন্ (Regina Olson) নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রেম-বন্ধন স্থাপিত হয়। অনতিকাল পর অলসন-এর প্রতি তাঁর প্রেম উজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে ছেদ টানেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর সারাজীবন তিনি রচনার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করবেন। লেখকের পক্ষে বিবাহিত জীবন বাধা স্বরূপ হতে পারে বলেই তিনি এই প্রেম পাশের সমাপ্তি ঘটান।

তাঁর এম. এ. ক্লাশের নিবন্ধ "The Concept of Irony" ছিলো কিয়ার্কেগার্ডের প্রথম রচনা। এতে তিনি হেগেলীয় চিন্তাধারার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এটি ছিলো এক উচ্চ-কোটির রচনা এবং এর গুরুত্ব আজও আছে। এসময়কার লেখাগুলো তিনি ছদ্মনামে প্রকাশ করতেন। ১৮৩৬-এ তাঁর একপ্রকার নৈতিক আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি একপ্রকার দুর্জ্ঞেয় (mysterious) সার্বিক (universal) নৈতিক আদেশানুসারে চলছে থাকেন। তবু তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি হয় না। কিয়ার্কেগার্ড-এর এই মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁর *Either-Or* নামক পুস্তকে পরিস্ফুট। অবশেষে সমস্ত দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ১৮৩৬-এর তিনি খৃষ্টধর্মকে তাঁর শেষ পন্থা হিসেবে গ্রহন করেন। তিনি বলেছেন যে মানুষের সর্বশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম। তিনি বলেন, জীবন অর্থহীন, আর তাই এই অর্থহীন জীবনের উত্তরন ঘটিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চির শান্তি এবং পরম যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে হবে। তাঁর নিজের জীবনকে তিনি তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যৌবনের মুক্ত জীবনকে তিনি বলেছেন নান্দনিক কাল। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জাগতিক অনুভূতি উপভোগ করাই হলো এই সময়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর পরবর্তী সময়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই মুক্তি প্রকৃত মুক্তি নয়, ভ্রান্ত মুক্তি। নান্দনিক উপলব্ধির মাঝখানে এসে দাঁড়ালো নৈতিক দায়িত্ববোধ। তিনি সার্বিক এবং অলঙ্ঘনীয় নৈতিক আদর্শ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পেয়েও গেলেন তা, কিন্তু এতেও শান্তি পেলেন না তিনি। সার্বিক ও অলঙ্ঘনীয় নৈতিক আদর্শের কালকে তিনি নৈতিকতার কাল বলেছেন। এ-কালেও তাঁর মুক্তি হলো না এবং তিনি এক হার্দিক অথবা আত্মিক যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করতে লাগলেন। অবশেষে সমস্ত যন্ত্রনার অবসান ঘটলো খৃষ্টধর্মে আবার ফিরে এসে, ঈশ্বরে আত্মসমর্পন করে। অবশ্য তিনি খৃষ্টধর্মকে প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই ত্যাগ করেননি। শুধুমাত্র এই সময়ের পূর্বে চিন্তার জগতে খৃষ্টধর্মে তিনি কোন যাথার্থ্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না। জীবনের শেষ সময়ে অর্থাৎ নৈতিক কালের পরবর্তী সময়ে তিনি আবার এই খৃষ্টধর্মের যাথার্থ্য দেখতে পেলেন। ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পিত কালকেই তিনি বলেছেন ধার্মিক কাল।

কিয়ার্কেগার্ড বিশ্বাস করতেন যে শুধু তাঁর নিজের জীবনেই এই তিনটি কাল দেখা দেয়নি, প্রতিটি ব্যক্তিকেই এই তিনটি স্তর বা কালকে অতিক্রম করতে হয় সারাজীবনে। তাঁর বচনাগুলোকে অনেকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের লেখাগুলো হলো অদৃশ্য কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিয়ার্কেগার্ড এরূপ বিশ্বাস করতেন। আর তাঁর শেষ জীবনের রচনাগুলো খৃষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব-সঞ্জাত।

কিয়ার্কেগার্ড 'ব্যক্তিগত খৃষ্টধর্মে' বিশ্বাসী ছিলেন এবং 'প্রতিষ্ঠানগত খৃষ্টধর্মের' ছিলেন একনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি বলতেন যে গীর্জায় যদি কেউ না যায়, তবে সে অন্ততঃ একটি পাপ থেকে রেহাই পায় — সে তার এরূপ আচরনদ্বারা প্রমান করে যে নিউ টেস্টামেন্টের (New Testament) ধর্ম আর খৃষ্টধর্ম এক জিনিষ নয়। তাঁর এরূপ উক্তির কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একদিন (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) রাস্তায় হঠাৎ মুর্চ্ছা যান এবং অল্পকাল পরেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি বলেছিলেনঃ "বোমার বিস্ফোরন ঘটেছে, লেলিহান অগ্নিশিখা আসছে।" কিয়ার্কেগার্ড ছিলেন চরম ব্যক্তিবাদী (individualist)। তাঁর স্বভাব ছিলো স্পর্শকাতর এবং তিনি সর্বদা কেমন একটা বিষন্নতায় আচ্ছন্ন থাকতেন। কোন এক অস্বচ্ছ হতাশায় তিনি চিরজীবন ভারাক্রান্ত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর রচনার সংখ্যা নেহাত কম নয়। মাত্র ১২ বছরে তিনি ২১ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলোঃ *The Concept of Irony* (১৮৪১), *Either-Or* (১৮৪৩), *Fear and Trembling* (১৮৪৩), *Philosophical Fragments* (১৮৪৪), *The Concept of Dread* (১৮৪৪), *The Present Age* (১৮৪৭), *Works of Love* (১৮৪৮), *Christian Discourses* (১৮৪৮), *Sickness Unto Death* (১৮৪৯), *Training in Christianity* (১৮৫০), *For Self-Examination* (১৮৫১), *Armed Neutrality* (১৮৫১), এবং *The Instant* (১৮৫৪-১৮৫৫)।

কিয়ার্কে গার্ড সক্রেটিসকে (Socrates) তাঁর আদর্শ হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। সক্রেটিসের মতোই তিনি বস্তুগত বিষয়কে উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর আদর্শ এবং লক্ষ্য ছিলো ভাবগত। যা আছে তাকে চোখবুঁজে গ্রহন করা চলবে না — দৃশ্যমান জগৎ অথবা আনুক্রমিক জীবন-ধারা অথবা প্রথাগত নৈতিকতাকে প্রশ্নের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে যে বাস্তব জগতে যা পরিবর্ত্তনশীল তার পশ্চাতে রয়েছে অপরিবর্তনীয় অনাদি অনন্ত এক সত্তা — পারমার্থিক সত্তা এবং নৈতিক সত্তা, উভয়ই। কাজেই বস্তুগত বিষয়ত্বকে (objectivity) অগ্রাহ্য করতে হবে। বস্তুগত বিষয়ত্ব ব্যষ্টি মানুষের অভিবাদন যোগ্য হতে পারে না। ব্যষ্টি মানুষ মুক্ত। তার আর্দশ, তার নৈতিকতা, তার দায়িত্ব — এক কথায় তার জীবনকাঠামো সে নিজে তৈরী করবে। এমনি এক সক্রেটিস-সুলভ দর্শনে বিশ্বাস করতেন কিয়ার্কেগার্ড। তিনি ছিলেন

পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি তাঁর একাগ্র প্রবণতাই হয়েতো তাঁকে অস্তিত্ববাদী করে তুলেছিলো। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞান তথা সমস্ত দার্শনিক চিন্তাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক। হেগেলীয় দর্শনে ব্যক্তিকে একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছে। আর তাই তিনি হেগেলীয় দর্শনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। হেগেলীয় পরমসত্তা-সর্বস্বদর্শনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। হেগেলীয় পরমসত্তা-সর্বস্ব দর্শনের প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন যে সত্য প্রকৃত পক্ষে বিষয়ীতেই অবস্থান করে। তাঁর এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়। প্রথমত, তিনি বলতেন যে জ্ঞান যেমন নিজেকেই অর্জন করতে হয়, অপর কেউ এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে না, তেমনি স্বীয়জ্ঞান অপর ব্যক্তিকেও দান করা যায় না। প্রতিটি ব্যক্তির জীবন স্বতন্ত্র এবং তাই প্রতিটি ব্যক্তির জ্ঞানও ভিন্ন। এমন জ্ঞানকে কী করে অপরের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে? নিজের অভিজ্ঞতাই নিজেকে জ্ঞান দান করে। আর তাই সার্বিক জ্ঞান বলে কিছু নেই। কিয়ার্কে গার্ড-এর অবৈজ্ঞানিক (?) চিন্তাধারা এখানে সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ কেবলমাত্র যৌক্তিক (rational) জীব নয়, তার আবেগ-ও আছে। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে মানুষের যুক্তি ও আবেগের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকাই স্বাভাবিক, কেননা আবেগ সর্বদা যুক্তির অনুশাসন মেনে চলে না — যুক্তির পথ এক, আর আবেগের পথ অন্য। কিন্তু কী করে এই দ্বন্দ্বের উত্তরন ঘটানো যায়? কিয়ার্ক গার্ড বলেন যে একমাত্র বিশ্বাস-কে অবলম্বন করেই মানুষ এই যন্ত্রনাময় যুক্তি ও আবেগের দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পেতে পারে। তিনি বলেন, মানুষকে অতিবর্তী ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে, যেমন কিয়ার্কেগার্ড নিজে খৃষ্টধর্মের কাছে আত্মসর্মপন করেছিলেন।

সীমিত মানুষ সবকিছুর জ্ঞান কখনোই লাভ করতে পারে না এবং পারবে না, আর তাই তার পক্ষে পূর্ণাঙ্গ দর্শন রচনা করা সম্ভব নয়, — জগতের এই গোলকধাঁধা থেকে পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সাহায্যের জন্য মানুষকে তার চেয়ে অনেকবড়, অনধিগম্য, অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরসদৃশ কোন বলিষ্ঠ সত্তার কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে, নিজেকে সঁপে দিতে হবে। তবেই তার মুক্তি, অন্য কোন পথে নয়। পৃথিবীতে মানুষ যেমন আসে সম্পূর্ণ একা, তেমনি তাকে চলে যেতে হয় পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ একা। যে ক'দিন সে এই পান্থ-নিবাসে থাকে সে ক'টি দিন সে কী করবে, তা-ও তাকে বলে দেয়া হয় না — তার নিজেকেই তা নির্ধারন করতে হয়। কিন্তু কোনরূপ মাপকাঠি বা নির্ণায়ক অথবা কোনরূপ আদর্শ তার কাছে নেই। কোনরূপ মাপ-কাঠি না থাকলে, কোনরূপ কেন্দ্র-বিন্দু বা উৎসভূমি না থাকলে কেমনকরে সে তার পথ ঠিক করবে? অথচ তাকে মার্গ-দর্শন করাবে এমন কেউ-ও নেই। তাহলে উপায়? কিয়ার্কেগার্ড বলেন, সবকিছু ঈশ্বরে সমর্পন করে এগিয়ে চলো, তাহলেই তুমি তোমার পথ দেখবে পাবে। তবে এ-ভিন্ন আরও একটি পথ, বাস্তবিক

বিধি-নিষেধের পথ। কিন্তু সে পথ তো সঠিক না-ও হতে পারে? কাজেই সে-পথ গ্রহন করা আর নিজের করতল দিয়ে নিজের চোখ ঢাকা একই কথা। তৃতীয়ত, কিয়ার্কে গার্ড বলেছেন যে জ্ঞান সব সময়ই হওয়া উচিৎ মূর্ত (concrete), অমূর্ত (abstract) নয়। প্রতিটি ব্যক্তির বাস্তবিক জীবনের সঙ্গে সেই ব্যক্তির জ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। এরূপ জ্ঞান হলো মূর্ত-জ্ঞান, আর ব্যক্তি-নিরপেক্ষ জ্ঞান হলো অমূর্ত জ্ঞান, যেখানে জ্ঞান আছে কিন্তু ব্যক্তি নেই। কিয়ার্কেগার্ড-এর মতে এরূপ অমূর্ত জ্ঞান অর্থহীন। জ্ঞান যদি জীবনের সমস্যা মেটানোর জনাই থেকে থাকে, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধানের জন্য চাই ব্যক্তি-সাপেক্ষ জ্ঞান।

মানব জীবনের যুক্তি এবং আবেগ ও অনুভূতির দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত ধাঁধাঁ থেকেই আসে অতিবর্তী বিষয়ের অস্তিত্বের ধারনা। সীমিত মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই আসে অসীম বিষয়ের অস্তিত্বের কল্পনা। এই অসীম বিষয়কেই কিয়ার্কেগার্ড ঈশ্বর বলেছেন। কিন্তু সীমিত মানুষ অসীম ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার কোন আশাই করতে পারে না। "ঈশ্বরকে জেনেছি" — একথা বলার অর্থই হলো ঈশ্বর সীমিত হয়ে গেছে। খৃষ্টধর্মের অভ্যন্তরে থেকেও তিনি বলেছেন যে ঈশ্বর জ্ঞানের অতীত। আবার ঈশ্বরকে মূর্ত-ও ভাবা যাবে না, কেননা তাহলে ধর্ম হয়ে পড়বে সার্বিক এবং বস্তুগত (objective)। কিন্তু ধর্ম স্বরূপত ব্যক্তি-সাপেক্ষ এবং অমূর্ত। হেগেলপন্থীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে সত্যকে কতকগুলো ধারনার পরিমন্ডলে সীমিত করা যায় না। তাছাড়া সত্য প্রকৃত পক্ষে বিষয়ীগত, বিষয়গত নয়। বিষয়গত সত্য অনন্ত উপান্তিক (endless approximation); কারন উপাধিযুক্ত বিষয়ী কখনোই বিষয়গত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই দর্শনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ বিষয়ীগত সত্য যা বিষয়ী অভিজ্ঞতা থেকে পেয়ে থাকে। তবে এই অভিজ্ঞতা হবে ব্যাপক বিশ্বে বিবিক্ত মানুষের, আর এই অভিজ্ঞতা হবে জীবন্ত পরমতত্ত্বের *(realitie vacué)* অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবন-পথে চলতে ঘাত-প্রতিঘাত সঞ্জাত অথবা বিশ্বের মুখোমুখি বিবিক্ত মানুষের উপলব্ধি-সঞ্জাত। কিয়ার্কেগার্ড মানুষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র, পূর্ণ-বিষয়ী হতে আহবান জানিয়েছেন।

কিয়ার্কে গার্ডমানুষকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। কেউ গৃহীত সামান্যকে (accepted universal) আঁকড়ে ধরে নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দেয়। এরূপ মানুষকে তিনি "বিয়োগান্ত নাটক" বলেছেন। আর একরকম মানুষ আছে যে গৃহীত সামান্যের কাছে নিজেকে বিসর্জন দিতে চায় না। সে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় না, বরং নিজের পরিচিতিকে উপলব্ধি করতে চায়। এমন মানুষ কালাতীত ঈশ্বরের স্বর্গীয় আদেশে বিশ্বাসী। বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজেকে সে খুঁজে পায়। অন্ধের মতো সে সামান্যকে গ্রহণ

করে না, নিজের ইচ্ছানুসারে বেছে নেয়া বিশ্বাসকে গ্রহন করে এবং তার ওপর নির্ভর করে সে চলে। তাই সে হলো মুক্ত। কিয়ার্কেগার্ড এরূপ বিশ্বাসী মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর এরূপ চিন্তাধারা কার্ল বার্থ-এর (Karl Barth) দ্বন্দ্বমূলক ধর্মতত্ত্বকে এবং পল্ টিলিক-এর (Paul Tillich) ধর্মদর্শনকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করেছে।

ফ্রেডরিক নিট্শে

কিয়ার্কেগার্ড-এর মতো আর একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হলেন ফ্রেড্রিক নিট্শে (Friedrich Nietzsche : ১৮৪৪-১৯০০)। হঠাৎ করে নিটশে-কে অস্তিত্ববাদী বললে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু কার্ল জেস্পর্স (Karl Jaspers) তাঁর গ্রন্থ *Nietzsche*-এ এবং হাইডেগার (Heidegger) তাঁর বই *Nietzsche*-এ নিটশেকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে দেখিয়েছেন। নিটশে-এর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ব্যষ্টিমানুষ এবং তার জীবন। অন্ততঃ এদিক দিয়ে তিনি অস্তিত্ববাদ থেকে দূরে নন। প্রাশিয়ার রুকেন-এর এক লুথেরীয় পাদ্রী পরিবারে নিটশে-এর জন্ম। অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। শুল্ফ ফোর্টা বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে তিনি বন ও লেইপসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁর মেধা এত তীক্ষ্ণ ছিলো যে মাত্র ২৪ বছর বয়েসে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করার পূর্বেই তিনি বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেকব বার্কহার্ট (Jacob Burckhardt) তাঁর সহকর্মী ছিলেন এবং রিচার্ড (richard) ও ওয়াগনার (Wagner) ছিলেন বন্ধু। কিন্তু দৈহিক-মানসিক (psychosomatic) অসুস্থতার জন্য তিনি ১৮৭৯-এ ঐ পদে ইস্তফা দেন এবং ফ্রান্স, ইতালি ও সুইজারল্যান্ডের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এর মধ্যেই তিনি বেশ কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করে ফেলেন। তাঁর অসুস্থতার সময় বোন এলিজাবেথ মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা-শুশ্রুষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৮৮৯-এ তিনি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পরের বছর তুরিনের (Turin) রাস্তায় একদিন হঠাৎ মুর্চ্ছা যান এবং ১৯০০-এ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : *The Birth of Tragedy* (১৮৭২), *Human, All too Human* (১৮৭৮), *The Gay Science* (১৮৮২), *Beyond Good and Evil* (১৮৮৬), *Towards a Genealogy of Morals* (১৮৮৭), *Thus Spake Zarathustra* (১৮৮৩-১৮৯১) এবং *Anti-Christ* (১৮৯৫)। *Zarathustra*-এ তাঁর কাব্য প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর রয়েছে। ভাষার শৈলী, রচনার বলিষ্ঠতা, সুসংহত সংক্ষিপ্ততা তাঁর রচনাকে, বিশেষভাবে *Zarathrustra*-কে, সমসাময়িক জার্মানি সাহিত্যের শিখরে উন্নীত করেছিলো। তাঁর লেখাগুলো সূত্রাকারে গ্রথিত, বলিষ্ঠ এবং আবেগ মিশ্রিত।

নিটশে-কে নীতি-দার্শনিক বলা যেতে পারে। আধিবিদ্যক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা তাঁর থাকলেও তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন নৈতিক আদর্শের ওপর।

Beyond Good and Evil-এ নৈতিকতাকে দুটোভাগে ভাগ করেছেন — প্রভুর নৈতিকতা এবং দাসের নৈতিকতা। কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে প্রভুত্বকামিতা, আর কারো কারো মধ্যে আছে দাসত্বের মনোভাব। দাসত্বের মনোবৃত্তিকে তিনি ঘৃণা করেছেন। *The Birth of Tragedy* নামক পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীক সাহিত্যের বিয়োগান্ত নাটকে রয়েছে মার্জিত (Apollonian) রুচি ও আবেগ-বিধুর (Dionysian) রুচির সংমিশ্রন। আর তাই এমন সাহিত্য হতে পেরেছে অতি উন্নত মানের। নিট্‌শে মানুষের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন প্রভুত্বকামিতা — প্রচন্ড প্রভুত্বকামিতা। তাঁর কাল্পনিক অতিমানব (Superman) দাসত্বের মনোভাবকে ছিন্ন করে আত্ম-প্রকাশ করবে দুর্দান্ত এক প্রভু হিসেবে। *Anti-Christ*-এ তিনি বলেছেন যে ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে, আর তাই খৃষ্টধর্মেরও অবসান হবে, দাসত্বের মনোভাব দূরীভূত হবে। তিনি দার্শনিককে হাতুড়ি-হাতে উঠে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন ("to philosophize with a hammer")। পুরনো, মৃত নৈতিকতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে, আর তখনই দেখা দেবে অতিমানবের নৈতিকতা যা মানুষকে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করবে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে দেহকে অস্বীকার করা চলবে না। শক্তির আকাঙ্খা (Will to Power) জাগিয়ে তুলতে হবে হীনমন্য মানুষগুলোর মধ্যে। নিট্‌শের এরূপ উক্তির জন্য মাইকেল ফুকো (Michel Foucault) তাঁর সঙ্গে ফ্রয়েড ও কার্ল মার্ক্স-এর তুলনা করেছেন।

নিট্‌শে ছিলেন পরিপ্রেক্ষিতবাদী (perspectivist) তাঁর মতে সর্বব্যাপী সত্য বলে কিছু নেই। মানুষই হবে সত্যের নির্ণয়ক, আর সব সত্যই হবে আপেক্ষিক। মানুষের চেতনা নীরস যুক্তি-ময় নয়, তাতে আছে অনুভূতি আবেগ ইচ্ছা। এসবকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু যুক্তিকে গ্রহন করলে প্রকৃত মানুষকে পাওয়া যাবে না। মানুষের মধ্যে রয়েছে এক অদম্য শক্তির ইচ্ছা বা ইচ্ছা-শক্তি (Will to Power)। দর্শনকে তিনি যুক্তি-ভিত্তিক মনে করনেনি। তাঁর *Beyond Good and Evil*-এ তিনি বলেছেন যে দর্শন হলো দার্শনিকের ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি (personal confession) অথবা অনিচ্ছাকৃত জীবন-স্মৃতি (involuntary memories)। নিট্‌শে-এর এরূপ বক্তব্যই তাঁকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক করে তুলেছে অনেকখানি। তাছাড়া, তিনি ছিলেন জীবনমুখী দার্শনিক। এই কারনেই তিনি শোপেন হাওয়ার-এর (Schopenhauer) নৈরাশ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। যীশু খৃষ্টকে তিনি ভর্ৎসনা করেছিলেন এজন্য যে যীশু মানুষকে অত্যন্ত ছোটকরে দেখেছিলেন। মানুষের জয়গান করে ছিলেন বলেই হয়েতো ফ্যাসীবাদী (facist) নাৎসীরা (Nazi) নিট্‌শে-কে শিরোধর্য্যে মনে করতো। তাঁর এরূপ দার্শনিক চিন্তাধারা ইতিহাস-দার্শনিক ওসওয়াল্ড স্পেঙলার-কেও (Oswald Splengler) প্রভূতভাবে প্রভাবিত করেছিলো। তাছাড়া, জেস্পার এবং হাইডেগার-এর অস্তিত্ববাদী দর্শনেও নিট্‌শে-এর ছায়া পড়েছে।

অবভাস-বিজ্ঞান থেকে অস্তিত্ববাদ

কিয়ার্কেগার্ড ও নিটশে-এর মধ্যে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা থাকলেও তা প্রকৃত অস্তিত্ববাদী দর্শন হিসেবে দানা বেঁধে ওঠেনি। অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রসার লাভ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষয়িষ্ণু সমাজে দেখা দিয়েছিলো নৈতিকতার অভাব, আত্মবিশ্বাসের হ্রাস এবং অপসৃয়মান আশা। বিবিক্ত মানুষের হতাশা-নৈরাশ্য থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলো নতুন প্রজন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তান্ডবলীলায় মানুষের যূথবদ্ধতার নিগড় ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর প্রতিটি মানুষ ছিটকে পড়ে সামাজিক আত্মিক বাঁধন থেকে। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি ক্ষীণ হয়ে আসে, জনবহুল শহরে থেকেও মানুষ নিজেকে বিবিক্ত মনে করে। এ-থেকে আসে তার অসহায়তার ভাব, নিরাশা আর জীবনের মূল্যহীনতার বোধ। জীবন কেন? আমরা বেঁচে থাকবো কেন? জীবনের পরম উদ্দেশ্য কী? নৈতিকতার অর্থ কী? এমন হাজারো প্রশ্ন এসে হাজির হলো মানুষের দুয়ারে। এতকাল যেসব সর্বব্যাপী সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক বাঁধন ও রাজনীতিকে অভ্রান্ত বলে ধরে রেখেছিলো মানুষ, বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসয়তায় তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রত্যয়িত হলো। তাহলে জীবন কি নিরর্থক? মানুষ কি কোন অদৃশ্য শক্তির সৃষ্টি, অথবা যন্ত্রিক প্রজননের ফল এবং কোন এক কারন-কার্য শৃঙ্খলায় বাঁধা? মানুষের কি মুক্তি নেই এই যান্ত্রিকতা থেকে? বিশ্বযুদ্ধে মানুষ দেখেছে মানবতার চেয়ে পৈশাচিকতাই বড়, মানুষের চেয়ে যন্ত্রই অধিক শক্তিশালী। মানুষ ভাবলো, তার জন্ম জীবন ও মৃত্যু কি সুতোয়-বাঁধা পুতুলের আসা-যাওয়ার মতো? নিজেকে মানুষ এমনিতর সব প্রশ্ন করতে লাগলো। আর তাই দার্শনিক চিন্তাধারায়ও এলো এক নতুন দিগপরিবর্তন। দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ স্বয়ং। এই হলো অস্তিত্ববাদের জন্ম-লগ্নের বাতাবরন।

অবভাস-বিজ্ঞানে হুসের্ল বারবার বলেছেন ঃ বস্তুতে ফিরে চলো (*zu den Sachen*)। অর্থাৎ প্রকৃত অভিজ্ঞতায় ফিরে যাও। আমরা বস্তুকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করি, বস্তু প্রকৃতপক্ষে তেমন নয়। আমাদের প্রকৃত বস্তুর অভিজ্ঞতাকে আমরা বিভিন্ন পূর্বানুমান দিয়ে রঞ্জিত করে থাকি। যেমন একটি বস্তুর প্রত্যক্ষণ হওয়া মাত্র আমরা অনুমান করি যে ঐ বস্তুটির অবশ্যই ওজন আছে এবং অস্তিত্ব আছে। এখানে ওজন এবং অস্তিত্ব হলো বস্তুটি সম্পর্কে পূর্বানুমান। এই পূর্বানুমানগুলো "প্রকৃত বস্তুটিকে" যেন আবৃত করে রাখছে। কিন্তু পূর্বানুমান এসেছে প্রত্যক্ষণকারীর চেতনা থেকে। প্রত্যক্ষণকারী বা বিষয়ীর চেতনাতেই বস্তুটি এই সব পূর্বানুমানগুলোর দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। হুসের্ল তাই বিষয়ীকে অর্থাৎ বিষয়ীর চেতনাকে অনুধাবন করতে চাইলেন। তিনি জানতে চাইলেন, বিষয়ীর চেতনার সারসসত্তা কী? এবং কেন এই চেতনায় এসব পূর্বানুমানগুলো থাকে? কিন্তু অস্তিত্ববাদীগণ বললেন যে চেতনা সারসত্তা-বিহীন, শূণ্য (empty)। বিশুদ্ধ

চেতনায় কোন আধেয় নেই, বিশুদ্ধ চেতনার কোন বৈশিষ্ট্য নেই, বিশুদ্ধ চেতনার একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো বস্তু-অভিমুখীনতা। অস্তিত্ববাদীগণ বললেন যে বিশুদ্ধ চেতনার কেবল অস্তিত্ব আছে, সারসত্তা নেই। চেতনা যখন যে বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন সে তার বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে। একখন্ড কাঁচের কোন রং থাকে না। কিন্তু একে রক্ত-পদ্মের কাছে নিলে কাঁচ-খন্ডটি লাল বর্ণ ধারন করে, আবার নীলোৎপলের সান্নিধ্যে ঐ কাঁচ-খন্ড নীল বর্ণ ধারন করে। তেমনি চেতনা যখন যে বস্তুর সন্নিকটে আসে অর্থাৎ যে বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, তখন সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে। সুতরাং চেতনার কোন সারসত্তা নেই। তবে চেতনার যে অস্তিত্ব আছে তা অবিসংবাদিত। অবভাস-বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে অস্তিত্ববাদীগণের অভিযোগ এই যে অবভাস-বিজ্ঞানীগণ চেতনার অস্তিত্বকে অলক্ষ্যে এড়িয়ে গেছেন। তবু হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানেও আমরা অস্তিত্ববাদের সূচনা পেতে পারি। চেতনার সারসত্তা অনুধাবনের ব্যর্থতা সম্পর্কে হুসের্ল নিজেই বলেছেন যে "শত বন্ধনীযুক্ত-করন সত্ত্বেও বিশুদ্ধ চেতনা বা আত্মাকে ধরা যাবে না।" অবভাস-বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ-চেতনার অস্তিত্বকে বন্ধনীযুক্ত রেখে তার সারসত্তাকে জানবার চেষ্টা করা হয়। অস্তিত্ববাদের ভূমিকা ঠিক বিপরীত। এখানে অস্তিত্বই বড় কথা, সারসত্তা গৌণ। তবে চেতনার ক্ষেত্রে সারসত্তার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

অস্তিত্ববাদে অস্তিত্বের ধারনাটি বস্তুগত নয়, অর্থাৎ শুধুবস্তুময় বিষয়ই অস্তিত্বশীল, এমন নয়। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। গাছের ডালে দুটো পাতা এমনভাবে রয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে একটি পাখী ঐ গাছের ডালে বসে আছে। এখানে পাখীটির এক প্রকার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে (তা না হলে পাখীটিকে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে কেন?) যদিও বাস্তবিক পক্ষে পাখীটি ডালে বসে নেই। মনঃসমীক্ষক (psychoanalyst) ফ্রয়েড-ও এরূপ অবাস্তব বিষয়ের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। অনেক মানসিক রোগীর অমূল ভয় বা শঙ্কা (free-floating fear) থাকে। কোন এক অদৃষ্ট অজানা বস্তু বা বিষয়ের ভয়। বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে বা বাস্তব জগতে নেই, কিন্তু রোগীর কাছে ঐ বস্তুটির অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। অস্তিত্ববাদে এমনসব বিষয়কেও অস্তিত্বশীল বলা হয়েছে। যে কোন বিষয়কে দুভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে ঃ আমরা জানতে চাইতে পারি বস্তুটি কী, অর্থাৎ বস্তুটির সারসত্তা কী; অথবা জানতে চাইতে পারি বস্তুটি বা বিষয়টি আছে কি নেই। এই শেষ প্রকারের অনুসন্ধানই অস্তিত্ববাদী অনুসন্ধান। অস্তিত্ব ও সারসত্তার মধ্যে তিন প্রকারের সম্পর্ক থাকতে পারে। প্রথমত, অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সারসত্তা নেই। ওপরের দুটি পাতা এবং পাখীর দৃষ্টান্ত এখানে প্রযোজ্য। যে পাখীটি আমি দেখতে পাচ্ছি তার এক প্রকারের অস্তিত্ব অবশ্য আছে, কিন্তু যেহেতু পাখীটি বস্তু-জগতে প্রকৃত পক্ষে নেই, সেহেতু তার কোন সারসত্তা

থাকতে পারে না। তেমনি চেতনার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সারসত্তা নেই। দ্বিতীয়ত, কোনকিছুর সারসত্তা থাকলেও অস্তিত্ব না-ও থাকতে পারে। যেমন, 'আকাশ-কুসুমের' সারসত্তা আছে, কিন্তু অস্তিত্ব নেই। আকাশ কুসুমের ধারনার মধ্যে তাব সারসত্তা রয়েছে, কিন্তু 'আকাশ-কুসুম' বাস্তব জগতে নেই। অথবা, আকাশ-কুসুমকে আমরা অভিজ্ঞতায় পাই না। তৃতীয়ত, কোনকিছুর অস্তিত্ব এবং সারসত্তা উভয়ই থাকতে পারে। যেমন একটি বটবৃক্ষের যেমন অস্তিত্ব আছে, তেমনি তার সারসত্তা রয়েছে। কাজেই কোন বিষয়ের সারসত্তা থাকলেই তার অস্তিত্ব থাকতে হবে, এ যেমন নয়, তেমনিভাবে কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকলেই তার সারসত্তা থাকতে হবে, এমনও নয়। তবে আমরা শুধু বলতে পারি যে কোনকিছুর অস্তিত্ব থাকলে যেমন তার সারসত্তা থাকবার সম্ভাবনা আছে, তেমনি কোনকিছুর সারসত্তা থাকলেও তার অস্তিত্ব থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এগোতে গিয়েই অস্তিত্ববাদীগণ অস্তিত্বের নতুন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছেন। তাই বলা যায় যে কিয়ার্কেগার্ড ও নিট্‌শে-এর অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার পরবর্তী অস্তিত্ববাদ অবভাস-বিজ্ঞান থেকেই এসেছে। হাইডেগার, জেস্পার্স, সার্ত্র প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ প্রথমে হুসের্ল-এর অবভাস-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারা অবভাস-বিজ্ঞানের অসারতা উপলব্ধি করে অস্তিত্ববাদী দর্শন রচনা করেন। হাইডেগার বলেন যে মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তার অস্তিত্ব অবভাস-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অতীত। অবভাস-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো অতিবর্তী চেতনা। হাইডেগার এখানে আপত্তি তুলেছেন যে অবভাস-বিজ্ঞান জীবন্ত মানুষকে — যে মানুষের আবেগ আছে, ইচ্ছা আছে, পছন্দ-অপছন্দ আছে — সে মানুষকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র তার চেতনাকে অনুধাবন করে, তার অতিবর্তী চেতনাকে জানতে চায়। বাস্তবিক জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছেন হুসের্ল। অস্তিত্ববাদের জীবনমুখীনতা এবং মানবতা এখানে সুস্পষ্ট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অযৌক্তিক অমানবিক আচরণ ও ঘটনাবলি সমকালীন দার্শনিকগণের যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারায় আঘাত হেনেছিলো। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ ভাবলেন যে মানুষ প্রকৃতপক্ষে একটি অযৌক্তিক (irrational) জীব। তাছাড়া, অবভাস-বিজ্ঞান অমূর্ত (abstract) মানুষের চেতনাকে বিশ্লেষণ করে, যার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যাবলিই অনুপস্থিত থাকে। 'অমূর্ত মানুষ' অর্থে তাই বিশুদ্ধ চেতনা-সম্পন্ন মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু মানুষ কখনোই বিশুদ্ধ চেতনা-সম্পন্ন নয়। তার চেতনায় রয়েছে আবেগ, ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি। এসব উপাধিযুক্ত মানুষই হলো মূর্ত মানুষ (concrete man)। অস্তিত্ববাদে এই মূর্ত মানুষের, জীবন্ত মানুষের পরিস্থিতি (situation) নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ বলেন যে

দর্শনকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হলে একে জীবন্ত মানুষের জীবন-সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। এমনিভাবে হাইডেগার মানব জীবনের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলেন। তবে মানব গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনকে জানা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। কারণ প্রতিটি মানুষের জীবন-যাত্রা যেমন ভিন্ন, প্রতিটি ব্যক্তির পরিবেশ যেমন ভিন্ন, প্রতিটি মানুষের ভাবনা, ইচ্ছা, আকাঙ্খা যেমন ভিন্ন, তেমনি প্রতিটি মানুষের জীবনের সমস্যাও ভিন্ন ভিন্ন। তাই দার্শনিককে ভাবতে হবে জীবন্ত ব্যষ্টি মানুষের একান্ত সমস্যা নিয়ে। অস্তিত্ববাদ তাই সার্বিক বা সর্বব্যাপী (absolute) এবং অমূর্ত দার্শনিক চিন্তায় আগ্রহী নয়। একই কারণে অস্তিত্ববাদ জ্ঞানতত্ত্ব অথবা অধিবিদ্যায় ততখানি ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না। আবার একই কারনে অস্তিত্ববাদ কান্ট অথবা হেগেল-এর অমূর্ত সারসসত্তার দর্শনের প্রতীপ।

অস্তিত্ববাদ মনে করে যে দার্শনিকআলোচনা কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না, কেননা প্রতিটি দার্শনিকের পরিস্থিতি ভিন্ন। অস্তিত্ববাদীগণের মতে দর্শন তাই সাপেক্ষ হওয়াই উচিৎ। তথাপি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই মিল রয়েছে। যেমন প্রতিটি ব্যক্তিরই মৃত্যুর পর শূণ্য (nothing) হয়ে যাবার একপ্রকার ভয় (dread) রয়েছে; প্রতিটি ব্যক্তিই মনে করে যে তার জীবনের একটা অর্থ থাকা উচিৎ অথচ কোন অর্থ সে খুঁজে পায় না এবং এরজন্য তার আছে একপ্রকার বিমর্ষতা (Angst); ইত্যাদি। এরূপ কিছু সাধারন বিষয় নিয়েও আস্তিত্ববাদ গভীরভাবে চিন্তা করে। আবার, মানুষ চায় একপ্রকার মুক্তি — সমস্ত রকম প্রথাগত চিরাচরিত রীতি-নীতি থেকে মুক্তি, অথবা জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি। এই মুক্তির কথাও অস্তিত্ববাদ চিন্তা করে। যুক্তি-ভিত্তিক দর্শন মানুষকে যুক্তির কঠিন কাঠামোতে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চায়, অথচ অস্তিত্ববাদ মনে করে যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ-কার্য শৃঙ্খালায় সে আবদ্ধ নয়। এমন এক অবস্থায় সে কী করবে? তার কী করা উচিৎ? আবার সে নিজে যা করবে তা সে অন্য সব মানুষের অনুসরনের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ করবে। সে চায়, সে যা করবে সব মানুষই তা-ই করুক। যেমন, সে যদি বিশেষ এক পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করে, তবে তার অর্থ হলো এই যে তার মতে উক্ত পরিস্থিতিতে সব মানুষই আত্মহত্যা করতে পারে। তার আচরন যেন সব মানুষের আচরনের আদর্শ-স্বরূপ, তার নিজের জন্য তার যে বিধান তা যেন তার মতে সব মানুষের জন্য বিধান। কি কঠিন দায়িত্ব তার! এমনি এক ভাবনা থেকে আসে ব্যক্তির একপ্রকার অস্থিরতা (anxiety)। অস্তিত্ববাদ মানুষের এরূপ সমস্যা-সঙ্কুল দিকগুলোও তুলে ধরতে চেষ্টা করে। শুধু তুলে ধরা নয়, এসব সমস্যার সমাধানও খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। তাই জীবন-বিমুখ কান্ট-হেগেল-হুসের্লীয় দর্শনের প্রতি অস্তিত্ববাদের অভিযোগ। এবং এই অভিযোগ থেকেই অস্তিত্ববাদের জন্ম। আমরা আরও বলতে

পারি যে অবভাস-বিজ্ঞান থেকেই হয়তো আধুনিক অস্তিত্ববাদের জন্ম। তবে অবভাস-বিজ্ঞানের মূলতঃ নঞর্থক দিকই অস্তিত্ববাদকে দিয়েছে এক নতুন দিগন্ত। কিন্তু ড্যাগোবার্ট ডি. রুন্স্-এর (Dagobert D. Runes) মতে অস্তিত্ববাদ অথবা অস্তিত্ববাদী দর্শন (existential philosophy) লক্ (Locke) ও বার্কলি-এর (Berkeley) দর্শন থেকে সূত্র সংগ্রহ করে পদার্থবিদ কির্চহফ-ই (Kirchhof) আধুনিককালে সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন। তাঁর মতে রিচার্ড এ্যাভেনরিয়াস (Richard Avenarius), পদার্থবিদ আর্নষ্ট ম্যাক্ (Ernst Mach), মনোবিজ্ঞানী হুবন্ড (Wundt) ও টিচেনার (Titchner) এবং হোয়েফডিং (Hoeffding)-এর লেখাতেও অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা রয়েছে। কাজেই অস্তিত্ববাদ কেবলমাত্র অবভাস-বিজ্ঞান থেকে উপজাত হয়েছে, একথা বলা বোধকরি ঠিক হবেনা।

অস্তিত্ববাদের বিস্তার

অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন, বিশেষ করে পাঁচজন প্রধান সমসাময়িক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক — হাইডেগার (১৮৮৪-১৯৩৬), মার্লু-পন্টি (১৯০৮-১৯৩৬), জেস্পার্স (১৮৮৩-১৯৩৬), টিলিক (১৮৮৬-১৯৩৬) এবং সার্ত্র (১৯০৫-১৯৩৬)। এদেঁর মধ্যে মার্লে-পন্টি এবং সাত্র্ হলেন ফরাসী, আর বাকী তিনজন জার্মান। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অস্তিত্ববাদের উর্বর ক্ষেত্র হলো জামানী ও ফ্রান্স। তবে জামানীতে অস্তিত্ববাদের জন্মও হলেও ফ্রান্সেই এর বিকাশ ঘটেছে। এর কারন হয়েতো এই যে ফরাসীদের মানসিকতা অস্তিত্ববাদের অনুকূলে। জার্মানরা স্থির যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক মানসিকতার অধিকারী, আর ফরাসীরা কিছুটা আবেগ-প্রবণ এবং জীবনমুখী। অস্তিত্ববাদের আবেগ-প্রবণতা এবং জীবনমুখীতা ফ্রান্সে অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলো। এই কারণেই আমরা অস্তিত্ববাদের তীর্থক্ষেত্র বলতে ফ্রান্সকেই বুঝে থাকি। আর একই কারনে অস্তিত্ববাদের বষট্কার হলেন জাঁ-পল্ সার্ত্র।

মার্টিন হাইডেগার

মেরি ওয়ার্নক (Mary Warnock) বলেছেন যে মার্টিন হাইডেগার-কেই (Martin Heidegger) প্রথম "প্রকৃত অস্তিত্ববাদী" দার্শনিক বলা যায়। অবশ্য হাইডেগার নিজের সম্পর্কে এরূপ উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে তিনি তাঁর অসমাপ্ত বিখ্যাত গ্রন্থ *Being and Time*-এ যে দার্শনিকভাবনার কথা বলেছেন, তা অস্তিত্ববাদ ভিন্ন আর কিছু নয়। জামানীর মেস্কার্চ-এ (Messkirch) ১৮৮৯-এ এক ক্যাথলিক পরিবারে তাঁর জন্ম। ফ্রাইবুর্গ (Freiburg) বিশ্ববিদ্যালয়ে হুসের্ল-এর অধীনে তিনি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর প্রবন্ধে (thesis) তিনি ডান্ স্কটাস-এর (Dun Scotus) ওপর আলোচনা করেছেন। ফ্রাইবুর্গ-এ অধ্যয়নরত অবস্থাতেই হাইডেগার অবভাস-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এমন কি তাঁর প্রধান গ্রন্থ *Being and Time* হুসের্ল-সম্পাদিত *Jahrbuch*-এ ১৯২৭ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হতে থাকে। ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হুসের্ল-এর অবসর গ্রহনের পর ১৯২৯-এ দর্শনশাস্ত্রের আসনে (Chair of Philosophy) অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৩-এ তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর-এর পদে নিযুক্ত হন। অনতিকাল পর তিনি জামানীর রাজনৈতিক নায়ক হিটলারের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যায়ের রেক্টর হিসেবে এক ভাষনে তিনি মুক্তকণ্ঠে হিটলার-এর জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রবাদকে সমর্থন করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর ইহুদী গুরু হুসের্ল থেকে দূরে সরে আসতে লাগলেন। ১৯৩৪-এ তিনি রেক্টর পদে ইস্তফা দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ফ্রাইবুর্গ-এর এক পাহাড়ে বাস করতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে অল্প সংখ্যক ছাত্রকে

দর্শন শেখাতে লাগলেন। হাইডেগার-এর প্রধান প্রধান রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ *Being and Time* (১৯২৭), *What is Metaphysics* (১৯২৯), *Hölderlin and the Essence of Poetry* (১৯৩৬), *What is Thinking?* (১৯৫৪), *On the Question of Being* (১৯৫৫), *The Question Concerning the Thing* (১৯৩৬) এবং *Phenomenology and Theology* (১৯৩৬)।

ক্যাথলিক পরিবারের সন্ত টমাস-এর (St. Thomas) দর্শন-অভিষিক্ত পরিবেশে তিনি বেড়ে ওঠেন। রোমান ক্যাথলিক দর্শনে সন্ত টমাস-এর দর্শনের প্রভূত প্রভাব ছিল তখন। টমাস-এর দর্শন আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপন্থী। হাইডেগার কান্ট-এর দর্শনও যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে কী করে এ্যারিষ্টটল (Aristotle), প্লেটো (Plato) এবং সক্রেটিস-এর (Socrates) পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মতো আধিবিদ্যক অনুসন্ধানে দর্শনকে ফিরিয়ে নেয়া যায়, তা-ই ভাবছিলেন তিনি এ সময়। দর্শনেরর ইতিহাস এবং অধিবিদ্যায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। এ-দুটি বিষয়ে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা হুসের্ল-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অবভাস-বিজ্ঞানে বিচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট বিষয়ের অর্থাৎ বিশেষের তাৎক্ষনিক অভিজ্ঞতার আভ্যন্তরিন বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামান্যীকরন করা যায়। হাইডেগার-ও এরূপ দার্শনিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে অভিজ্ঞতা ভিন্ন কেবলমাত্র যুক্তি-ভিত্তিক দর্শন হতে পারে না। এজন্যই তিনি যুক্তিবাদ (rotionalism) এবং ধীবাদের (intellectualism) পরিপন্থী ছিলেন। এক্ষেত্রে বোধকরি ডান্‌স্কটাস-এর দর্শনই তাঁকে যুক্তিবাদ ও ধীবাদের প্রতীপ করে তুলেছিলো। হাইডেগার এ্যারিষ্টটল এবং প্লেটো-এর সামান্য আকারের (universal form) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সামান্য বা সার্বিক (universal) মানুষ অথবা বস্তুর বা বিষয়ের মধ্যেই ব্যষ্টি মানুষ বা ঘোড়া রয়েছে। যদিও এ্যারিষ্টটল বলেছেন যে বিশেষেব মধ্যেই সামান্য থাকে, তবু আমরা বলতে পারি যে সামান্য থেকেই বিশেষের উৎপত্তি। কিন্তু কী করে সামান্য থেকে বিশেষের সৃষ্টি হয় এ্যারিষ্টটল তা বলতে পারেননি। অথবা এই বিশেষকে কী করে জানা যাবে, তা তিনি বলতে পারেননি। ডান স্কটাস এখানে এ্যারিষ্টটল থেকে এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ব্যষ্টিতে বা বিশেষে রয়েছে "এমনতা" বা বিশেষত্ব (this-ness) অথবা *haecceitas*. বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যেমন সামান্যকে জানতে পারি, আমাদের আন্তর অভিজ্ঞতার সাহায্যে তেমনি এই বিশেষত্বকে বুঝতে পারি। একটি ফুলে যেমন "কুসুমত্ব" আছে, তেমনি ঐ ফুলটিতে "বিশেষত্ব-ও" রয়েছে। সার্বিক "কুসুমত্ব" জ্ঞানমূলক বা সারসত্তামূলক এবং একে বুদ্ধিব সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু ঐ বিশেষ ফুলটির বিশেষত্ব অস্তিত্বমূলক এবং এই "বিশেষত্বকে" কেবলমাত্র আন্তর অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুধাবন করা যায়। সম্ভবতঃ ডান্‌ স্কটাস-এর এরূপ

বক্তব্যই হাইডেগার-কে অস্তিত্ববাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত করেছিলো।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের দিকেই হুসের্ল ও হাইডেগার-এর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। এ সময়ে *Encyclopaedia Britannica*-তে হুসের্ল ও হাইডেগার দুজনে মিলে অবভাস-বিজ্ঞানের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখবেন, ঠিক হয়েছিলো। হাইডোগর একটি খসড়া-ও তৈরী করেছিলেন, কিন্তু পরে দেখা গেলো যে হুসের্ল-এর প্রবন্ধটিই প্রকাশিত হয়েছে। হাইডেগার-এর খসড়াটিতে অস্তিত্ববাদের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ ছিলো। তিনি লিখেছিলেন যে দর্শনের উদ্দেশ্য হলো সত্তাকে (being) বিষয়রূপে জানা। তবে সত্তাকে জানতে হলে আমাদের চেতনাকে বা মনোযোগকে নিবদ্ধ করতে হবে বিষয়ের (object) চেতনার ওপর, বিষয়ের ওপর নয়। তিনি বলেন যে আমাদেরকে চেতনার ক্ষেত্রে ফিরে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন যে বস্তু কেবল চেতনার বাইরেই অবস্থিত নয়, চেতনার অভ্যন্তরেও বটে। টেবিলের ওপরের ফুল যেমন ঐ দূরে রয়েছে, তেমনি ওটি আছে আমার মনে বা চেতনায়। বস্তুকে বা বিষয়কে জানতে হলে তাই চেতনাকে অনুধাবন করতে হবে; কেননা, ফুল-রূপী ঐ বিশেষ বস্তুকে চেতনাই একটি বিশেষ বস্তুরূপে গঠন করেছে। সার্বিক ধারনাকে বুদ্ধির সাহায্যে জানা যায়, কিন্তু বিশেষকে জানতে হলে চেতনায় অবস্থিত বিশেষ বস্তুকে জানতে হবে। তাছাড়া, হাইডেগার বলেন যে চেতনায় অবস্থিত বিশেষ বিষয়কে বিশ্লেষণ করলেই আমরা সার্বিক বিষয়কে (ধারনাকে নয়) অর্থাৎ সমস্ত বিশেষ বিষয়েব আধাররূপে যে বিষয় রয়েছে তাকে জানতে পারবো। আধাররূপী এই বিষয়কে হাইডেগার সার্বিক সত্তা (Being) বলেছেন। সার্বিক সত্তায় যেমন সার্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এরূপ দার্শনিক চিন্তাধারাকেই বলা হয় অবভাস-বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ববাদ (phenomenological existentialism)। হাইডেগার ছিলেন অবভাস-বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ববাদী। তাঁর মতে অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন আছে বটে, তবে একমাত্র অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়। কারণ সববিষয় গুলোই একরকম নয়। মানুষ একটি বিষয় হলেও সে অন্যান্য সব বিষয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপরাপর বিষয় (যেমন, কলম, গাছ ইত্যাদি) যেমন তাৎক্ষণিকভাবে (immediately) গঠিত বা সৃষ্ট, মানুষ তেমনভাবে গঠিত নয়। একটুকরো পাথর আমরা যেমনভাবে দেখছি ওটি তেমনভাবেই সর্বদা থাকবে, ওটির কোনরূপ পরিবর্তন হবে না। তাছাড়া, পাথরের টুকরোটিকে আমরা সারসরিভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে (directly) দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পারি না। কারণ, মানুষের মধ্যে কেবল দেহ নেই (পাথরের টুকরোটির মতো), তাতে চেতনাও রয়েছে। মানুষের দেহ দেখে আমরা তার ভেতরকার চেতনা সম্পর্কে অনুমান করে থাকি। কাজেই মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায় না। অধিকন্তু, মানুষ একটুকরো পাথরের মতো অপরিবর্তনীয় কারণ-কার্য-শৃঙ্খলের দ্বারা বা কারনতার (causality)

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় অথবা পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ নিজেকে নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করতে পারে, নিজের মধ্যে ইচ্ছামতো পরিবর্তন ঘটাতে পারে (যদিও সীমিতভাবে)। কাজেই মানুষের অতিবর্তীভাবে গঠিত (transcendentally constituted) হবার সম্ভাবনা আছে। আবার অপরাপর বিষয় বা বস্তু পূর্ণভাবে গঠিত — এদের বর্ণনা দেয়া যেতে পারে, কারণ এদের তাৎক্ষণিক পরিবর্তন নেই। কিন্তু মানুষ কখনোই পূর্ণভাবে গঠিত নয়, এবং তাই মানুষের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। মানুষ কেবলমাত্র কতকগুলো সম্ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। তাই হাইডেগার বলেন যে অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর জন্য চাই অস্তিত্ববাদী পদ্ধতি — অস্তিত্ব বর্ণনা করার মাধ্যমে মানুষকে জানতে হবে। এখানে হাইডেগার অবশ্যই একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখানেই হুসের্ল থেকে হাইডেগার-এর মূল পার্থক্য। স্মরণ করা যেতে পারে যে ঐ খসড়ার পর থেকেই উভয়ের মধ্যে আর কোন সহযোগিতা ছিল না।

তবে হাইডেগার হুসের্ল-এর অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করেননি। তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার (immediate experience) পরীক্ষণের জন্য বা বিশ্লেষণের জন্য এরূপ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। হাইডেগারও অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানাকারগুলোকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে কোন প্রাচীর নেই। যদি এমন কোন প্রাচীর থাকতো, তাহলে বিষয়ী বিষয়কে কখানো জানতে পারতো না। তিনি বলেন, বিষয়কে বিষয়ী-ই সৃষ্টি করে থাকে। মূর্তি তৈরী হবার পূর্বে সেটি শিল্পীর চেতনায় থাকে। আবার আমরা যখন মূর্তিটি দর্শন করি তখনও আমরা আমাদের মতোকরে মূর্তিটিকে তৈরী করি — এজন্যই একই মূর্তি আমরা সবাই দেখি না। হাইডেগার বলেন যে মূর্তি তৈরী করার পূর্বে শিল্পীর চেতনায় যে মূর্তি রয়েছে, অথবা মূর্তিটি দর্শন করার সময় আমাদের চেতনায় যে মূর্তিটি রয়েছে, তাকে জানতে পারলেই মূর্তিটির স্বরূপ জানা যাবে। মূর্তিটির জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ এবং মূর্তিটিকে প্রত্যক্ষণ করার সময় আমাদের চেতনার ক্রিয়া এক এবং অভিন্ন, যেহেতু চেতনাই মূর্তিটি তৈরী করছে। চেতনায় অবস্থিত বিষয়কে (এখানে মূর্তিটি) হাইডেগার বিষয়ীগত-বিষয় (*Zuhandsein* অথবা being-at-hand) বলেছেন, এবং প্রকৃত বা বাস্তবিক মূর্তিটিকে বলেছেন বিষয়ী-অধিকৃত-বিষয় (*Vorhandsein* অথবা being on-hand)। জ্ঞানতত্ত্বের দিক দিয়ে আমরা বিষয়ীগত-বিষয় পূর্বে এবং বিষয়ী-অধিকৃত-বিষয় পরে পেয়ে থাকি।

বস্তু-সামগ্রীর মতো মানুষকেও আমরা এমনিভাবে জেনে থাকি। বস্তু-সামগ্রীকে এবং আত্ম-সচেতনতাহীন জীবকে হাইডেগার 'পরিবেশ' *(Umwelt)* বলেছেন, আর আত্ম-সচেতন মানুষকে বলেছেন 'পারস্পরিক জগৎ' *(Mitwelt)*। পারস্পরিক জগৎ দুরকমের হতে পারে — প্রকৃত (authentic) এবং অপ্রকৃত (inauthentic)। অপ্রকৃত

মানুষ অনেকটা জড় বস্তুর মতো; তার নিজস্ব কোন ভাবনা বা মতামত নেই। গতানুগতিক বা প্রথাগত বিধি-নিষেধকে সে দ্বিধাহীনভাবে এবং কোনরূপ প্রশ্ন না করেই গ্রহন করে। সে যেন পরিবেশের দাস। কিন্তু প্রকৃত মানুষ সম্ভাবনাময় এবং ভবিষ্যৎ-অভিমুখী। অপ্রকৃত মানুষ নিষ্ক্রিয়; পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে তার পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু তার নিজের ভবিষ্যৎ-প্রকল্প বলে কিছু নেই। কিন্তু প্রকৃত মানুষ সর্বদাতার জীবনের পরিবকল্পনা করে যাচ্ছে — নিজের ক্রিয়াকে বেছে নিচ্ছে একাধিক ক্রিয়ার মধ্য থেকে, এবং এভাবে অবিরাম নিজেকে গড়ে তুলছে। যে সব ক্রিয়াকে বর্জন করা হচ্ছে সেগুলো তার নঞর্থকদিকচিহ্নিত করছে। আর যেসব ক্রিয়াকে সে নির্বাচিত করেছে সেগুলো তার সদর্থক দিক চিহ্নিত করছে।

হাইডেগার বলেন যে (ব্যক্তির) সত্তার সঙ্গে সময়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সময় (Time) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের হতে পারে। প্রকৃত অতীত বা বিষয়গত অতীত শেষ হয়ে যায়, চলে যায়, এবং ভবিষ্যৎ থাকে অনাগত। প্রকৃত বা বিষয়গত কাল তাই কেবলমাত্র বর্তমান। কিন্তু বিষয়ীগত কালের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে অথবা থাকতে পারে। অতীতে ব্যক্তি যা করতে পারতো অথবা হতে পারতো তা বর্তমানে ব্যক্তির স্মৃতিতে উপস্থিত। আবার ভবিষ্যৎ-ও বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির সম্ভাবনার সমাহার নিয়ে। তাই ব্যক্তিতে বা ব্যক্তির চেতনায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাধারে উপস্থিত। হাইডেগার বলেন যে অতীতের অসম্পূর্ণ ক্রিয়া অর্থাৎ অতীতে যে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা হয়নি তা ব্যক্তির চেতনায় একপ্রকার অপরাধ-ভাবনা (guilt-feeling) এনে দেয়, আর এ থেকে উপজাত হয় বিমর্ষতা *(Angst)*। ব্যক্তি যা স্বেচ্ছায় নির্বাচিত ক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছিলো তা সম্পন্ন করার দায়িত্ব তার নিজের। অথচ সে ক্রিয়া সে সম্পন্ন করতে পারেনি। কাজেই তার একটা অপরাধ-বোধ বা অপরাধ-ভাবনা থাকাই স্বাভাবিক। আর এই অপরাধ-বোধ থাকলে তা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বিমর্ষতা আসতে পারে। হাইডেগার-এর দর্শনে এই অপরাধ-বোধ এবং বিমর্ষতা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

হাইডেগার-এর দার্শনিক চিন্তার মূল বিষয় হলো মানব-অস্তিত্বের বিশ্লেষণ। মানুষকে তিনি তত্র-সত্তা (Dasein) বলেছেন। মানুষকে তত্র-সত্তা বলার কারণ এই যে মানুষের নিজের মধ্যে কোন সারসত্তা নেই। মানুষ যা তা তার বাইরে। মানুষ যা করে, যা ভাবে, যা পরিকল্পনা করে — মানুষ তা-ই। কাজেই মানুষের বাইরেই মানুষটি রয়েছে, তার নিজের ভেতরে নেই। মানুষ এমন একটি সত্তা যা বাইরে রয়েছে বা "সেখানে রয়েছে" (being there)। অথবা মানুষ তার বাইরে রয়েছে (out there)। হাইডেগার দেকার্তের দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করেছেন। দেকার্ত চেতনা ও জগৎ-কে দুটো ভিন্ন বিষয় হিসেবে মেনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে মানুষ ও জগতের মধ্যে কোন

প্রাচীর নেই, আর তাই বরং বলা চলে যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে হলো জগতের-অভ্যন্তরে-মানুষ (being-in-the-world)। হাইডেগার বলেন, আমার সত্তা এমন জিনিস নয় যা আমার চামড়ার ভেতরে রয়েছে অথবা চামড়ার ভেতরে অবস্থিত কোন অবস্তুময় দ্রব্যের ভেতরে রয়েছে; আমার সত্তা একটি ক্ষেত্রে বা পরিধিতে ছড়িয়ে আছে যে ক্ষেত্র হলো এই সত্তার উদ্বেগের ভাবনার জগৎ। উইলিয়ম ব্যারেট (Willam Barrett) বলেন যে হাইডেগার-এর এই তত্ত্বকে ক্ষেত্র-তত্ত্ব বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন যেমন দ্রব্য-সম্পর্কে ক্ষেত্র-তত্ত্বের কথা বলেছেন, হাইডেগারও তেমনি মানুষ সম্পর্কে ক্ষেত্র-তত্ত্বের কথা বলেছেন। আইনস্টাইন দ্রব্যকে বলেছেন চুম্বকত্বের অথবা শক্তির ক্ষেত্র। তেমনিভাবে হাইডেগার মানুষকে পরমসত্তার (Being) একটি ক্ষেত্র বা পরিমন্ডল বলেছেন। একটি বস্তুকে যেমন চুম্বকত্বের একটি ক্ষেত্র হিসেবে ভাবা যেতে পারে, তেমনি একজন মানুষকে পরমসত্তার একটি পরিমণ্ডল হিসেবে ভাবা যেতে পারে। হাইডেগার এই পরিমণ্ডলকেই তত্র-সত্তা (Dasein) বলেছেন। পরমসত্তার এই পরিমণ্ডলে সর্বদা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কাজেই মানুষ নামক এই পরিমন্ডল কোন স্থায়ী এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয় নয়। তাঁর এরূপ দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য হাইডেগার এমনকি 'মানুষ' এবং 'চেতনা' শব্দ দুটিকে পর্যন্ত ব্যবহার করেননি তাঁর দর্শনে, কারণ তা হলে কার্তেজীয় দ্বৈতবাদ দর্শনে অবাঞ্ছিত ভাবে থেকেই যেতো। হাইডেগার-এর ধারনাকে আমরা একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝতে পারি। ছোট্ট শিশুটিকে নাম ধরে ডাকা মাত্রই সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে ঐ নামটি কাকে বোঝায় অথবা ঐ নামটি কার, তাহলে সে মা-কে অথবা বাবা-কে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিছুদিন পর ঐ শিশুকেই তার নামের কথা বললে সে নিজেকে দেখিয়ে দেবে। এ-অবস্থার পূর্বে শিশুটি তার নাম বলতে নিজের দেহ-মন অথবা নিজেকে বুঝতো না বটে, কিন্তু ঐ নাম যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রকে বা সত্তার ক্ষেত্রকে বোঝায় তা সে জানতো। ব্যারেট বলেন যে শিশুটির প্রতিক্রিয়া (নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়া) যথার্থ ছিল। কারন কারো নামের অর্থ তার দেহ বা মন নয় — তার নামের অর্থ একটি বিশেষ ক্ষেত্র বা সত্তার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। 'আমি' বলতে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিষয়ের একটি পরিমন্ডলকে বোঝায়, তবে অবশ্যই এই পরিমন্ডলের কেন্দ্র-বিন্দুতে কোন আত্মা অথবা ব্যক্তিত্ব নেই। এই পরিমণ্ডলের মূল বিষয় হলো আমার আমিত্ব (mine-ness)। শিশু বয়েস থেকে আমরা যখন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠি তখন বাইরে থেকে আসা অনেক সামাজিক রীতি-নীতি, পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-আকাঙ্খা, আদর্শ ইত্যাদি আমার এই নিরেট আমিত্বের সঙ্গে উপাধি হিসেবে যুক্ত হতে থাকে। ব্যারেট বলেন যে এভাবে হাইডেগার আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে হাইডেগার-এর পূর্বে দার্শনিকগণ আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করেছেন এবং ফলে বহির্জগৎ সম্পর্কে তাঁদের সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু হাইডেগার-এর দর্শনে আমার অস্তিত্ব এবং বহির্জগৎ ভিন্ন নয়। আমাদের কেউ-ই এমন কোন ব্যক্তিত্ব নয় বা আমিত্ব নয়, যা অপরাপর ব্যক্তিত্ব বা আমিত্ব থেকে এবং আমাদের বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমাদের কেউ-ই এমনকি কোন আত্মা-ই নয়। আমরা প্রত্যেকে একাধিকের মধ্যে একজন; প্রত্যেকে একটি নাম — আমাদের সহপাঠীদের, সহ-নাগরিকদের নামের মধ্যে একটি নাম। আমাদের অস্তিত্বের এই প্রাত্যহিক সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকেই হাইডেগার একম্ ('the One') বলেছেন। হাইডেগার বলেন যে এই একম্ হলো নৈব্যক্তিক বা সমষ্টিগত। এই একম্ আমাদেরকে বলে দেয় সমাজে বা পরিবেশে কার কীরূপ স্থান, কার কখন কী করা উচিৎ, অথবা কার কখন কী করা উচিৎ নয়। আমরা প্রত্যেকেই ব্যষ্টি-ব্যক্তি হবার পূর্বে এই একম্-এর মধ্যে ডুবে থাকি। মানুষের এই অবস্থাকে হাইডেগার 'পাতিত্য' (*fallenness* অথবা *verfallenheit*) বলেছেন।

এই পাতিত্যকে মেনে নেওয়াকে হাইডেগার অযথার্থ (inauthentic) জীবন বলেছেন। ব্যক্তি এখানে চিরাচরিত বিধিনিষেধকে বিচার না করেই গ্রহণ করে। আর যখন মানুষ এই পাতিত্যের উর্দ্ধে উঠে তার স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে কর্তব্য-কর্ম নির্ধারিন করে তখন তার জীবন হয় যথার্থ (authentic)। অযথার্থ জীবনে ব্যক্তি একম্-এর তলায় ডুবে যায় আর যথার্থ জীবনে সে এই একম্-এর উপর ভেসে উঠতে চায়। কিন্তু একম্-এর ওপরে উঠলেই বা একম্-এর পরিসীমার বাইরে গেলেই ব্যক্তিকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যেমন লোকে তাকে অস্বাভাবিক মনে করতে পারে, সমাজের সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, ইত্যাদি থেকে তার মানসিক যন্ত্রণা হয়। আর তাই আধুনিক মানুষ ক্রমশঃ নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে বির্সজন দিয়ে একম্-এর গহ্বরে ডুবে থাকবার নানা রূপ কৌশল সৃষ্টি করে চলেছে।

যথার্থই হোকঅথবা অযথার্থই হোক, হাইডেগার-এর মতে মানব জীবনের তিনটি প্রধান প্রলক্ষণ রয়েছে ঃ মেজাজ অথবা অনুভূতি (mood or feeling), বোধ (understanding) এবং ভাষা (speech)। হাইডেগার এ-তিনটিকে অস্তিত্বের উপাদান (existentialia) বলেছেন। আবার এ-তিনটিকে তিনি জীবনের বা অস্তিত্বের আকারও (categories of existence) বলেছেন। মেজাজ আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে জুড়ে থাকে। আমরা সাধারণতঃ বলি যে আমরা আনন্দিত অথবা দুঃখিত অথবা ভীত; কিন্তু হাইডেগার বলেন যে আমরাই বরং আনন্দ, দুঃখ অথবা ভয়। কারন এগুলো আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে জুড়ে থাকে। হাইডেগার-এর মতেআমাদের মূল বা প্রধান মেজাজ হলো উদ্বেগের (anxiety অথবা *Angst*) মেজাজ। একে মূল মেজাজ বলার কারন এই যে উদ্বেগের মধ্যেই একমাত্র আমরা নিজেদেরকে আমাদের কাছে উপস্থিত করি এবং নিজেরা নিজেদের শতচ্ছিন্ন স্বচ্ছ অস্তিত্বের প্রতি অবলোকন করতে পারি অর্থাৎ

আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপটিকে জানতে পারি। 'বোধ' বলতে হাইডেগার আমাদের সাধারন বোধকে বোঝাননি। সাধারন অর্থে কোন বিষয়কে বুদ্ধির সাহায্যে বোঝাকেই বোধ বলা হয়। কিন্তু হাইডেগার বলেন যে আমরা কোন বিষয়ের বোধ লাভ করার পর বুদ্ধির প্রয়োগ করি। উইলিয়ম ব্যারেট বোধের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : কোন ব্যক্তি তার উদ্ভাবিত একটি তত্ত্বের কথা আমাকে বোঝাচ্ছে। তার কথা শোনা মাত্রই আমার বোধ হচ্ছে যে তত্ত্বটি ঠিক নয়। কিন্তু কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে কেন আমার কাছে তত্ত্বটিকে ভ্রান্ত মনে হচ্ছে তখনই আমি বুদ্ধির সাহায্যে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করি। সুতরাং বোধ হলো বিষয়কে সরাসরি জানা বা বোঝা। বোধের ক্ষেত্রে বহির্জগৎ যেন আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করে দেয়। যেমন, সকালে ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ যেন আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করে। বস্তুকে বা বিষয়কে আমরা প্রাথমিকভাবে সরাসরি জেনে থাকি, কারন আমাদের অস্তিত্ব বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে। ভাষাকেও হাইডেগার অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। ভাষা শুধু শব্দের সমষ্টি নয়। নিস্তব্ধতাও ভাষার মতো কাজ করতে পারে। দুজন মানুষ আলাপ করছে। কিছুক্ষণ পর উভয়ই নিশ্চুপ হয়ে গেলো। এখানে নিশ্চুপতা বা নিস্তব্ধতা-ও (silence) হাইডেগার-এর মতে ভাষা, কারন নিশ্চুপ থেকেও উভয়ে পরস্পর একপ্রকার ভাষার মাধ্যমে আলাপ করছে — একে অপরকে বুঝছে।

কিন্তু সত্তা বলতে হাইডেগার কী বোঝেন? ব্যারেট বলেন যে হাইডেগার কোন প্রতিচ্ছবি (image অথবা picture) ব্যবহার করে সত্তাকে বোঝাননি। কারন তাঁর মতে সত্তার কোন প্রতিচ্ছবি হতে পারে না। সত্তা বলতে তিনি শুধু এক প্রকার অদৃশ্য, সর্বত্রবিরাজমান উপস্থিতিকে বুঝিয়েছেন "... presence, invisible and all-pervasive..")। এরূপ উপস্থিতির কোন ধারনা গঠন করা যেতে পারে না। যা হোক. মানুষকে হাইহেগার তত্র-সত্তা বলেছেন, কারন মানুষের পচিরয় রয়েছে মানুষের বাইরে — মানুষ যা করে, যা ভাবে, তা-ই সে। কোন ব্যক্তি শিক্ষক বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। কেন তিনি শিক্ষক? কারন শিক্ষকের চরিত্র বলতে যা বোঝায় তিনি তা-ই অণুকরন করছেন। কিন্তু শিক্ষকের চরিত্র তো ঐ-ব্যক্তির বাইরের বিষয়, ব্যক্তি নিজে হয়েতো নিজের মধ্যে অন্য কিছু। শিক্ষকের একটি বিশেষ চরিত্র সমাজ-কর্তৃক অনুমোদিত রয়েছে। ঐ ব্যক্তি এই অনুমোদিত চরিত্রই অনুকরণ করছেন, অভিনয় করছেন, আর তাই ঐ ব্যক্তি বিশেষ রকমের আচরন করছেন। যেন তিনি সর্বদা শিক্ষক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলছেন। ব্যক্তিটির চেতনা সবসময় শিক্ষক-চরিত্রের অভিমুখী ধাবিত হচ্ছে। এজন্যই হাইডেগার মানুষকে তত্র-সত্তা বলেছেন। তাছাড়া, মানুষ হলো একটি নিক্ষিপ্ত (thrown) বিষয়, কারন মানুষ পূর্ব-নির্ধারিত একটি বিশেষ সামাজিক,

মনোবৈজ্ঞানিক, নৈতিক এবং সৌন্দর্যবোধের পরিমন্ডলে জন্ম গ্রহণ করে। এরূপ বিশেষ একটি পরিমন্ডলে সে ইচ্ছে করে জন্মগ্রহণ করেনা। মানুষ যেন এই পরিমন্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কাজেই পৃথিবীতে আশার সময় মানুষের কোনরূপ স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীতে মানুষ একেবারে স্বাধীনতা-শূণ্য নয়। এখানে তার কিছুটা স্বাধীনতা রয়েছে এবং এই স্বাধীনতার প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত বা যথার্থ (authentic) মানুষ হতে পারে। হাইডেগার-এর দর্শন মানুষের এই স্বাধীনতাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ করে অধিবিদ্যায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা বিশেষের (particulars) প্রতি ততটা আগহী ছিলেন না যতটা ছিলেন সামান্যের (generals) প্রতি বা পরমসত্তার প্রতি। বিশেষ বস্তুগুলোকে তাঁরা এই উদ্দেশে কয়েকটি বিভাগে (categoriees) ভাগ করেছেন। এই বিভাগগুলোর সাহায্যে তাঁরা পরমসত্তাকে জানতে চেয়েছিলেন। হাইডেগারও পরমসত্তাকে জানতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন বিশেষের মাধ্যমে বা বিশেষ অস্তিত্বশীল বিষয়ের (being) মাধ্যমে পরমসত্তাকে বা সামান্য অস্তিত্বশীল বিষয়কে (Being) জানতে। আবার প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয় এবং পরমসত্তাকে জানতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা এক অতি গরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বের এবং অধিবিদ্যার পরিধির বাইরে রেখেছেন — তাঁরা কখনোই মানুষকে, ব্যাষ্টি মানুষকে বা হাইডেগার-এর তত্র-সত্তাকে (*Dasein*) জানতে চাননি। কিন্তু মানুষকে না জানলে পরমসত্তাকে পূর্ণভাবে জানা যাবে না, কেননা মানুষ-ও পরমসত্তার অন্তর্গত। তাই হাইডেগার মানুষকে বা তত্র-সত্তাকে জানতে আগ্রহী।

হাইডেগার-এর তত্র-সত্তা একটি অতি জটিল ধারনা। একে যেমন ভাষার মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না, তেমনি এর সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া যায় না। হাইডেগার বলেছেন যে এই তত্র-সত্তাকে বুঝতে হলে নিজেকেও একটি তত্র-সত্তা বলে ভাবতে হবে। তত্র-সত্তার কেবল অস্তিত্ব আছে। তবে তত্র-সত্তা বিবিক্ত নয়, সে রয়েছে পৃথিবীর মুখোমুখি। তাই পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে মানুষের কথা চিন্তা করা যায় না। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই হাইডেগার মানুষকে বলেছেন 'জগৎস্থিত মানবসত্তা' (being-in-the world)। অন্য ভাষায় জগতের অন্যান্য বস্তুর মত মানুষও প্রদত্ত (given)। কিন্তু বস্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এই যে মানুষ তার প্রদত্ত রূপটিকে অস্তিত্বে রূপান্তরিত করতে পারে। তার অস্তিত্বের ভিত্তি সমগ্র জগৎ। জগতের মধ্যে না থাকলে তার অস্তিত্ব নিরালম্ব হয়ে পড়ে। জগতের সঙ্গে মানুষ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলেই তার অস্তিত্ব একান্তভাবে তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। অস্তিত্বের অর্থ আত্ম-অতিক্রমণ ঃ নিজেকে অতিক্রম করে জগতের সঙ্গে আঙ্গিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যেই মানব অস্তিত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা মেলে।

হাইডেগার-এর দর্শনে কাল (time) একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ধারনা। তিনি বলেন, কাল মানুষের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ কাল-কে বস্তুগত বা বিষয়গত ভেবেছিলেন। তাঁদের মতে কাল বলতে কেবলমাত্র বর্তমান-কে বোঝায়, কেননা অতীত হলো সেই কাল যা শেষ হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যৎ হলো সেই কাল যা এখনো আসেনি। কিন্তু হাইডেগার বলেন যে মানুষের মধ্যে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এই তিন প্রকার কালই রয়েছে। তাঁর মতে মানুষ সর্বদা ভবিষ্যতের প্রতি ধাবিত হচ্ছে, মানুষের অস্তিত্ব ভবিষ্যৎ-কে ঘিরে রয়েছে। হাইডেগার বলেন যে মানুষ একপ্রকার প্রকল্প (project)। বর্তমানকালে মানুষ থাকে শূণ্য—সে কেবল ভবিষ্যতে কী হবে বা হতে চায়, তাই ভাবে। সুতরাং মানুষের অস্তিত্ব ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয়। আবার অতীতও স্মৃতি হিসেবে মানুষের মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যৎ তাই হচ্ছে সম্ভাবনা (possibility) আর অতীত হচ্ছে স্মৃতি। মানুষ সর্বদা ধাবিত হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতে সে কী হবে — এই হলো তার গভীরতম ভাবনা। এরূপ ভাবনা থেকে একপ্রকার অস্থিরতা (anxiety) এবং দায়িত্ববোধ (care) এসে পড়ে। দায়িত্ব আসে, কারন বুদ্ধি-বৃত্তি-সম্পন্ন মানুষের কাজগুলো পশুর কাজের মতো যথেচ্ছাচার হতে পারে না। মানুষের কাজ অবশ্যই কোন আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে হবে। ব্যক্তির নিজের কাজকে কখনোই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে ধরে নেয়া যায় না। ব্যক্তির যেকোন ক্রিয়া গোটা সমাজের মতে ঐ ব্যক্তির বেছে নেয়া আদর্শস্থানীয় কাজ। ব্যক্তি নিজে যা করছে তা যেন সে গোটা সমাজকে করতে বলছে। কাজেই ব্যক্তির ওপর গুরু দায়িত্ব এসে যাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে সে তার আদর্শ নির্ধারিন করবে? তার হাতের কাছে তো আদর্শ নিরূপণ করার কোন উপায় (cue) নেই? প্রথাগত বিধি-নিষেধকে প্রশ্নাতীত বলা যায় না। আবার এগুলোকে সে যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে নতুন কোন বিধি-নিষেধ সে কেমন করে নির্বাচন করবে? কোন্ বিষয়ের ভিত্তিতে সে আদর্শ তৈরী করবে, অথবা কোন্ বিষয় থেকে আদর্শ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করবে? তার সামনে তো কোন নিশ্চিত এবং প্রশ্নাতীত বিন্দু নেই যেখান থেকে সে তার চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে পারে? এমন পরিস্থিতি মানুষকে ভাবিয়ে তোলে, এবং কোন অবলম্বন না পেয়ে মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে, ভীত (dread) হয়ে পড়ে, আর এ থেকেই আসে তার অস্থিরতা (anxiety)। যদি সে অযথার্থ (inauthentic) মানুষের মতো প্রথাগত আদর্শকে গ্রহণ করে, তাবে তাঁর সঙ্গে দ্রব্য-সামগ্রীর কোন পার্থক্য থাকে না। কিয়ার্কেগার্ড মানুষের এরূপ অবস্থাকে বলেছিলেন 'আমৃত্যু জড়া' (sickness unto death) আর হাইডেগার একে বলেছেন 'বিষন্নতা' (anguish)। এমন অবস্থায় মানুষকে রক্ষা করার মতো পৃথিবীতে যেন কেউ নেই। মানুষ তখন ব্যাপক পৃথিবীতে নিজেকে অসহায়, বিবিক্ত মনে করে। আর তাই তার এক অজানা অমূলক ভয় (dread) হয়। আমরা যাকে সাধারনতঃ ভয় বলি, তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন ভয়ঙ্কর জানা বস্তু বা বিষয়

থাকে। কিন্তু হাইডেগার-এর এরূপ অজানা অমূলক ভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন বস্তু বা বিষয় থাকে না। এমন ভয়ে ব্যক্তি নিজেকে কোন এক অদৃশ্য হস্তের দ্বারা নিজেকে ধৃত বলে মনে করে। এই অদৃশ্য হাত বা শক্তি যেন ব্যক্তিকে 'যথার্থ মানুষ' এবং 'অযথার্থ মানুষের' দুটো ভিন্ন পথের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে আদেশ করে। ঐ শক্তি যেন বলে ঃ ''তুমি তোমার নিজের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিজেই বেছে নাও।'' কিন্তু কেমন করে সে নিজের সঠিক পথটি বেছে নেবে (Choice)? কী তার যুক্তি হবে। কে তাকে সাহায্য করবে? তার মনে হয়, সে যেন অনাহুতের মতো পৃথিবীতে এসেছে। এখানে আসবার তার যেন কোন যুক্তিই নেই (no reason), এবং শেষ পর্যন্ত সে ভাবে যে সে যেন এখানে এসেছে শুধু মরবার জন্য ("being for death")।

এই মৃত্যু চিন্তাও হাইডেগার-এর দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। হাইডেগার-এর পূর্বে আর কোন দার্শনিক মৃত্যুর ভয়াবহ অযৌক্তিক স্বৈরাচারী মূর্তি এমনভাবে তুলে ধরেননি। মৃত্যুর কাছে ব্যক্তি অসহায়। তার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু কখন তার মৃত্যু হবে তা সে জানে না। সে যেন খামখেয়ালী মৃত্যুর ভৃত্য। তার জীবন অস্তিবাচক, কিন্তু মৃত্যু নাস্তি-বাচক — মৃত্যু তাকে শূণ্য করে ফেলে (nothingness)। মৃত্যু একমুহূর্তে তাকে অস্তিবাচক অবস্থা থেকে নাস্তিবাচক অবস্থায় পরিণত করে ফেলে। মৃত্যু হলো মানুষের বিচরণ ক্ষেত্রের পরিসীমা। মৃত্যুর কাছে তাকে একা যেতে হবে। মৃত্যুর কবল থেকে তার অব্যাহতি নেই, অথবা বলা যেতে পারে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে বাস করছে। এমনিভাবে জীবন অতিবাহিত করা আর প্রতিক্ষণে মৃত্যুবরণ করা একই কথা। মানুষ যথার্থ মানুষের মতো বাঁচতে চায়, কিন্তু মৃত্যু তার স্বাধীনতা হরণ করে তাকে অযথার্থ মানুষের মতো বেঁচে থাকতে বাধ্য করে। এই হলো মানুষের চরম বিয়োগান্ত নাটক।

মৃত্যু-চিন্তা থেকেই হাইডেগার 'নাস্তির' (nothingness) চিন্তায় উপনীত হয়েছেন। তাঁর পুস্তক *What is Methphysics*-এ তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞান কেবল যা আছে তাই নিয়ে ব্যস্ত, যা নেই তা নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করে না। হাইডেগার-এর মতে অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এই 'নাস্তি'ও থাকা উচিৎ। যুক্তি-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ভাবলে অবশ্য নাস্তি সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা চলেনা, কিন্তু হাইডেগার বলেন যে জীবনে এমন সময় আসে যখন আমরা নাস্তির ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়াই। মৃত্যুর মুখোমুখি অথবা কোন মারাত্মক বিষয়ের মুখোমুখি হয়ে আমরা অনেক সময় এই নাস্তিকে উপলব্ধি করি। আমরা তখন অস্তিত্বশূণ্য হয়ে পড়ি। হাইডেগার বলেন যে নাস্তি অস্তির প্রতীপ নয়, নাস্তির-ও একপ্রকার অস্তিত্ব আছে। প্রসঙ্গত পোডোলনি-এর পুস্তক *Something Called Nothing*-

এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এ পুস্তকে লেখক বলেছেন যে পদার্থের যেমন শক্তি আছে, শূণ্যতারও তেমনি অস্তিত্ব আছে। আবার পদার্থেরর যেমন শক্তি আছে, শূণ্যতারও তেমনি একপ্রকার শক্তি আছে। শুধু তা-ই নয়, লেখকের মতে পদার্থের শক্তির চেয়েও শূণ্যতার শক্তি অধিক। নাস্তিকে আমরা যখন উপলব্ধি করি তখন তাতে কোন অর্থ বা যুক্তি অথবা যাথার্থ্য থাকে না। আবার যুক্তি বা বুদ্ধির অধ্যাসগুলোও তাতে থাকে না। নাস্তির মুখোমুখি হলে আমরা একেবারে শূণ্য হয়ে পড়ি, অথচ ঐ শূণ্যতা আমাদের কাছে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। শুধু আমাদের শূণ্যতাই অস্তিত্বশীল হয়েয় ওঠে না, আমাদের বাইরের বিশ্ব জগৎ-ও শূণ্য হয়ে পড়ে এবং এগুলের শূণ্যতাও অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। নিজের অস্তিত্বকে হারাতে আমাদের ভীষণ ভয় হয় (dread)। আমার অস্তিত্ব তো একদিন শেষ হয়ে যাবে (মৃত্যুতে) আর তাই বলা যেতে পারে যে 'আমি জীবন পথে চলছি' একথার অর্থই হলো এই যে 'আমি নাস্তির পথে ধাবিত হচ্ছি'। নাস্তির মুখোমুখি হয়ে পরক্ষণে আমরা যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসি, তখনই বুঝতে পারি যে এতক্ষণ আমরা নাস্তির মুখোমুখি ছিলাম। হাইডেগার বলেন যে নাস্তির মুখোমুখি থাকার সময় আমাদের যে ভয় (dread) হয় সেই ভয়ই নাস্তিকে আমাদের সামনে পরিস্কারভাবে তুলে ধরে। ভয়ের সময় তত্র-সত্তা নাস্তিতে পরিণত হয়, কিন্তু তত্র-সত্তা যদি কখনো নাস্তিকে অতিক্রম করতে পারে অর্থাৎ নাস্তির মধ্যেও নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পারে, তাহলে তত্র-সত্তা তার বিশুদ্ধ অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। হাইডেগার-এর দর্শনে নাস্তি ও ভয় বিশেষ ভূমিকা এবং গুরুত্ব অধিকার করে আছে। ফুলার তাঁর *A History of Philosophy*-এ বলেছেন যে হাইডেগার-এর নাস্তির ধারনার সঙ্গে হেগেল-এর নাস্তির ধারণার মিল রয়েছে। হাইডেগার-এর মতো হেগেল-ও বলেছিলেন যে নাস্তি-ই হলো আদি (Primordial) বিষয় বা পরমসত্তা (Being) অথবা সবকিছুর ভিত্তি-ভূমি বা উৎস-স্থল (ground)। সবকিছু নাস্তি থেকেই উৎপন্ন হয় এবং নাস্তিতেই ফিরে যায়। পরমতত্ত্ববিদ্যা বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব বিদ্যা (ontology) বলতে হাইডেগার সীমিত অস্তিত্বের (তত্র-সত্তা) অনুসন্ধানকে বুঝিয়েছেন। সীমিত অস্তিত্ব (being) পূর্ণ অস্তিত্বের আধারে থাকে এবং পূর্ণ অস্তিত্ব (Being) নাস্তির (Nothing) আধারে রয়েছে।

জীবনের শেষ দিকে হাইডেগার ভাষা ও শব্দের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন যে শব্দ (word) হলো প্রকাশমূলক। শব্দ যেমন পূর্ণ-সত্তাকে প্রকাশ করে, তেমনি সীমিত অস্তিত্বকে বা তত্র-সত্তাকেও প্রকাশ করে। শব্দের এই প্রকাশ করার দক্ষতার জন্য বা শক্তির জন্য একে হাইডেগার কাব্য-ধর্মী (poetic) বলেছেন। শব্দ যতখানি যুক্তি বহন করে, তার চেয়ে বেশী বহন করে প্রকাশ-ধর্মীতা বা

কাব্য-ধর্মীতা, যদিও ব্যক্তির মধ্যে (*Ek-sistenz*) যুক্তি ও প্রকাশ-ধর্মীতা উভয়ই রয়েছে। শব্দের মাধ্যমে অস্তিত্বকে প্রকাশ করে মানুষ তার স্বাধীনতাকে তুলে ধরছে। এমনি গূঢ় এবং কাব্য-ধর্মী দর্শন দেখতে পাই আমরা হাইডেগার-এর শেষ জীবনের লেখার মধ্যে।

কার্ল জেস্পার্স

হাইডেগার-এর পর প্রধান জার্মান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হলেন কার্ল জেস্পার্স (Karl Jaspers) (১৮৮৩-১৯৫৬)। তাঁর দর্শনকে অস্তিত্ব দর্শন (Existenz-philosophy) বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। সম্ভবত অস্তিত্বের ওপর তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বলেই তাঁর দর্শনকে অস্তিত্ব-দর্শন বলা হয়। জার্মানির ওল্ডেনবুর্গ শহরে তাঁর জন্ম। হাইডেলবুর্গ এবং মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথমে আইন-শাস্ত্র এবং পরে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ১৯০৯ সালে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত তিনি হাইডেলবুর্গ-এ মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। এসময়ে অর্থাৎ ১৯১৩-এ তিনি হাইডেলবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধ্যাপক (privat-dozent) নিযুক্ত হন। মনস্তত্ত্বের গবেষণা এবং মানসিক রোগের চিকিৎসা জেস্পার্স-এর মধ্যে অধিবিদ্যার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। ১৯২১-এ তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক (Professor) নিযুক্ত হন। হিটলার ক্ষমতায় এলে ১৯৩৭-এ জেস্পার্স-কে অধ্যাপক পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়, অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর তিনি ঐ পদ ফিরে পান। ১৯৪৮-এ জেস্পার্স বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক এবং হাইডেগার-অনুসারী হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি এরূপ উপাধি পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে তাঁর তিন খণ্ডে লেখা এবং ১৯৩২-এ প্রকাশিত *Philosophy* নামক পুস্তকখানিই প্রধান গ্রন্থ। জেস্পার্স-এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হলো ঃ *General Psychopathology (১৯১৩), Psychology World Views (১৯১৯), Reason and Existence (১৯৩৩), Neitzsche (১৯৩৬), Existence Philosophy (১৯৩৮), The Question of Guilt (১৯৪৬), Nietzsche and Christianity (১৯৪৬), The Origin and Goal of History (১৯৪৯), Reason and Anti-reason in Our Time (১৯৫০), On Tragedy (১৯৫২), On the Conditions and Possibilities of a New Humanism (১৯৫৬) এবং Ciphers of Transcendence (১৯৫৬)*।

জেস্পার্স নিট্‌শে ও কিয়ার্কেগার্ড-এর দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিট্‌শে এবং কিয়ার্কেগার্ড উভয়ই জগতে মানুষের পরিস্থিতিকে

(Condition) তাঁদের দার্শনিক চিন্তার মূল কেন্দ্রস্থল বলে মনে করতেন। তবে জেস্পার্স-এর মতে এঁদের দর্শন ছিল অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ। তিনি তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের অবস্থাকে বা পরিস্থিতিকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বার বার বলেছেন যে দর্শনকে মানব-কেন্দ্রিক হতে হবে। তাঁর বই *Perennial Scope of Philosophy*-এ তিনি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্রোটোগোরাস-এর (Protagoras) মতোই বলেছেন যে মানুষই সবকিছুর মানদণ্ড, মূল্য-নির্ণয়ক। আর তাই মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে নিজেকে জানা। জেস্পার্স মানুষের পরিস্থিতিকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর লেখায় তিনি শুধুমাত্র নিজের বক্তব্যই তুলে ধরেননি, অন্যান্য দার্শনিকদের কথাও বিচার করে দেখেছেন। জেস্পার্স দর্শনকে সত্যের চিরন্তন খোঁজ হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি বিশেষ করে ভারত, চীন এবং পশ্চিমী দেশগুলোর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে মানব-জীবনের লক্ষ্য ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ যুগে এক এক রকম হয়েছে। জেস্পার্স-এর মতে পরম সত্য বলে কিছু নেই, সত্য আপেক্ষিক এবং কাল-সাপেক্ষ। তিনি প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ডারউইন-উত্তর যে সব চিন্তানায়ক প্রগতির কথা বলেছিলেন, জেস্পার্স তাঁদের সমালোচনা করেছেন। সত্য যদি আপেক্ষিক ও কাল-সাপেক্ষ হয়, তাহলে দর্শনে প্রগতি অথবা মানুষের দার্শনিক জীবনের উদ্দেশ্যমূলক একাভিমুখীনতা থাকতে পারে না। কারন যুগে যুগে মানব-সমাজের উদ্দেশ্য পাল্টে যাচ্ছে। কাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রগতি কথাটির অর্থ থাকতে পারে বটে, কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে নয়।

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত জেস্পার্সকে কান্ট (Kant) অনুসারী অস্তিত্ববাদী বলেছেন, কারন জেস্পার্স-এর মতে সত্য বিষয়েও নেই, আবার বিষয়ীতেও নেই। সত্য হলো পূর্ণ (Comprehensive), আর জগতে যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা সবই অবভাসিক এবং আপেক্ষিক। পূর্ণের মধ্যে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ নেই। জ্ঞানাকারের (Categories) ভেতর দিয়ে তাকাই বলে আমরা কেবল জগৎ-প্রপঞ্চকে দেখি, পূর্ণকে দেখি না। কিন্তু জেস্পার্স আমাদেরকে জগৎ-প্রপঞ্চের ভেতর পূর্ণকে প্রত্যক্ষ করতে বলেছেন। জগৎ-প্রপঞ্চ হলো পূর্ণের প্রতীক। জগৎ-প্রপঞ্চ অবভাসিক বলেই আমাদের বোঝা উচিৎ যে পূর্ণই এর প্রকৃত সত্য। অবভাসের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে অবভাসের বাইরের পূর্ণকে দেখবার শক্তিই হলো প্রজ্ঞা (insight) এবং যিনি এভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, তিনি অতিবর্তী-স্তরে পৌঁছুতে পারেন। অতিবর্তী-স্তরের অভিজ্ঞতা শনৈঃ শনৈঃ হয় না, এর অভিজ্ঞতা হয় অকস্মাৎ। জেস্পার্স বলেন, কান্ট অবভাসিক স্তরেই তাঁর দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘোষনা করেননি।

তিনি অবভাসের-অতীত পূর্ণের দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। যিনি কান্ট-এর এই দিকটি বুঝতে পারেননি, তিনি কান্ট-কে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেননি। পূর্ণের অভিজ্ঞতা জগৎ-প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতার মতো নয়—এর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। জগৎ প্রপঞ্চকে আমরা জ্ঞানাকারগুলোর মাধ্যমে জানি, কিন্তু পূর্ণকে আমরা জ্ঞানাকারগুলোর মাধ্যমে জানিনা, পূর্ণের অভিজ্ঞতা হয় সরাসরিভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে। তাই পূর্ণের অভিজ্ঞতাকে জেস্পার্স জ্ঞান বলতে অস্বীকার করেছেন। জ্ঞানাকারগুলোর মাধ্যমে জগৎ প্রপঞ্চকে জানাকে তিনি জ্ঞান বলেছেন, আর পূর্ণকে জানাকে বলেছেন অ-জ্ঞান (non-knowledge)। তবে তাঁর মতে পূর্ণের জ্ঞানও বিষয়ীগত জ্ঞান নয়, পূর্ণের জ্ঞানও বিষয়গত জ্ঞান (objective knowlege), কেননা পূর্ণ তো অন্য সব বিষয়ের মতোই অস্তিত্বশীল, কাল্পনিক নয়। জেস্পার্স বলেন, পূর্ণের জ্ঞান যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে হতে পারে না। পূর্ণ এত বিরাট এবং বিস্তৃত যে সীমিত জ্ঞানকারগুলোর মধ্যে তাকে ধরা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ এই পূর্ণকে জানা। তাঁর মতে যে কোন দেশের এবং যে কোন কালের দর্শনের লক্ষ্যই প্রকৃতপক্ষে ছিল এই পূর্ণের জ্ঞান, পূর্ণের ভিত্তি, বৈশিষ্ট্য, আধেয় (content) জানা এবং পূর্ণের বিচার করা। জেস্পার্স বলেন যে পূর্ণের পূর্ণ-জ্ঞান শুধু দর্শন নয়, বিজ্ঞানও দিতে পারে না। বিজ্ঞান পূর্ণের অংশগুলোকে জানতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ণতো অংশের সমষ্টি নয়, তার চেয়েও বেশী, তার চেয়েও বড়। বিজ্ঞান কখনো কখনো বলে থাকে যে সে পূর্ণকে জানতে পারবে। জেস্পার্স বলেন যে দর্শনের একটি কাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের এরূপ ধারনার অবসান ঘটানো। বিজ্ঞান আমাদেরকে শুধু অবভাসিক জ্ঞান দিতে পারে। কিন্তু মানুষের জীবন শুধু এই অবভাসিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না, তার জীবন গড়ে ওঠা উচিৎ পূর্ণকে ভিত্তি করে। পূর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে তার ধারনা, বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সবকিছুর বিচার হবে এবং তার জীবনের মূল্যায়ন করা হবে।

জেস্পার্স-এর পূর্ণের বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। পূর্ণই সবকিছু। পূর্ণের মধ্যেই মানুষ রয়েছে। পূর্ণ মানুষকে ঘিরে আছে, মানুষকে আচ্ছাদিত করে আছে। পূর্ণকে দুটি দৃষ্টিকোন থেকে অনুধানব করা যেতে পারে—ব্যক্তি মানুষের বাইরে যে বিরাট অস্তিত্ব আছে তা-ই সেই পূর্ণ, অথবা ব্যক্তি-মানুষ নিজেও সেই পূর্ণ। ব্যক্তি-মানুষকে জেস্পার্স তত্র-সত্তা বা তত্রাস্তি (*dasein* : *da*=there-অথবা তত্র, এবং *sein*=be অথবা সত্তা অথবা অস্তিত্ব) বলেছেন। মানুষই কেবল তত্র-সত্তা নয়, বৃক্ষলতা, পশু-পাখি সবই জেস্পার্স-এর মতে তত্র-সত্তা। বিরাট পূর্ণের আধারে অগণিত এই তত্র-সত্তাগুলো রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য তত্র-সত্তাগুলো থেকে মানুষ-

তত্র-সত্তার পার্থক্য এই যে মানুষ শুধু তত্র-সত্তা নয়, চেতনা-ও বটে। এ-ভিন্ন মানুষের মন বলেও একটি বিষয় আছে। কাজেই মানুষ একাধারে তত্র-সত্তা, চেতনা এবং মন। তত্র-সত্তা হিসেবে মানুষের অন্যান্য তত্র-সত্তার মতো জৈবিক, মনোবৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-বৈজ্ঞানিক সত্তা রয়েছে। কিন্তু মানুষের চেতনা তাকে দিয়েছে এক অভিনব বিষয়—তার অব্যক্ত (potential) অস্তিত্ব, যার অবিরাম প্রকাশ প্রতিক্ষণ ঘটছে। আর তাই তার সারসত্তা বলে কিছু নেই, কারণ মানুষ তো কখনো পূর্ণ-বিকশিত বা পূর্ণ মূর্ত (finished) বিষয় নয়। তাহলে কেমন করে তার সারসত্তা নির্ধারন করা যাবে? পক্ষান্তরে অপরাপর তত্র-সত্তা পূর্ণবিকশিত বা পূর্ণ-মূর্ত, তাই এগুলোর সারসত্তা আমরা নির্ধারন করতে পারি। জেস্পার্স আরও বলেন যে মানুষ শুধুমাত্র তত্র-সত্তা, চেতনা ও মনের সমাহার নয়, তার মধ্যে রয়েছে এই ত্রয়ীর গণ্ডিকে অতিক্রম করে অতিবর্তী বিরাট পূর্ণ সত্তাকে (transcendent Being) উপলব্ধি করার শক্তি। এই বিরাট সত্তার মুখোমুখি হয়ে মানুষ ভাবে যে চারপাশের এই বিরাট সত্তার দ্বারা সে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই বিরাট সত্তার দৈশিক ও কালিক প্রকাশ মানুষকে ঘিরে আছে। তাছাড়া এই বিরাট সত্তার উপাদানগুলোও মানুষকে নিয়ন্ত্রনে রেখেছে। মানুষ এই আপতিক অনতিক্রম্য নিয়ন্ত্রনের মধ্যে নিজেকে প্রথমে অসহায় মনে করে। কিন্তু পর মুহুর্তেই সে ভাবে যে এই নিয়ন্ত্রক আবরনের বাইরে রয়েছে এক অজ্ঞাত ভূমি (unknown ground) যা হলো অতিবর্তী (transcendent) এবং যার আধারে সীমিত বিষয়সমূহ রয়েছে। এই সীমিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অপরাপর মানুষ। চেতনাবিহীন, মনবিহীন তত্র-সত্তাগুলো পূর্ণের সম্মুখীন হয় না, কিন্তু মানুষ হয় এবং হয় বলেই তার পরিস্থিতি অন্যান্য তত্র-সত্তাগুলোর মতো নয়। মানুষ নিজেকে নিক্ষিপ্ত বস্তু হিসেবে মেনে নিতে পারে না। সে চায় পূর্ণকে জানতে, পূর্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক জানতে এবং অপরাপর তত্র-সত্তাগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক জানতে। তাই মানুষের অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু অন্যান্য তত্র-সত্তার কোন সমস্যাই নেই।

পূর্ণের মুখোমুখি মানুষ দু'ভাবে নিজের পরিস্থিতি-সঞ্জাত সমস্যার সমাধান করতে পারে। সে নিজেকে চেতনা-বিহীন তত্র-সত্তার মতো মনে করতে পারে এবং এভাবে সমস্যা-বিজড়িত পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি তা-ই করে, তাহলে সে যথার্থ (authentic) মানুষ হতে পারে না—তার যাথার্থ্য (anthenticity) থাকতে পারে না। কিন্তু জেস্পার্স মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। অথচ কেমন করে মানুষ যথার্থ মানুষের সমস্যা-বিজড়িত পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাবে, এ-বিষয়ে তিনি কোন উপায় নির্দেশ করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন যে কাউকে কেউ এরূপ উপায়ের অনুসন্ধান

দিতে পারে না। অধিকন্তু তিনি বলেছেন যে তাঁর দর্শনের উদ্দেশ্য এরূপ উপায় উদ্ভাবন নয়। তাঁর দর্শনের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার সমস্যা-বিজড়িত পরিস্থিতি সম্পর্কে শুধুমাত্র সচেতন করে দেওয়া। মানুষকে তিনি জানাতে চাইছেন যে সে শুধু তত্র-সত্তা নয়, তার চেতনা আছে এবং আছে আধ্যাত্মিকতা (*Geist* অথবা spirit)। তবে এর চেয়েও বড় কথা এই যে মানুষের অস্তিত্ব আছে —মানুষ হলো অস্তিত্বশীল বিষয় (Existenz)। কখন মানুষের অস্তিত্ব থাকে? জেস্পার্স বলেন, মানুষ যখন বুঝতে পারে যে তার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা (possibility) আছে যেগুলো এখনো বাস্তবায়িত করা হয়নি, তখনই তার অস্তিত্ব থাকে। অর্থাৎ যখন সে বুঝতে পারে যে সে এখনো পূর্ণ নয়, পূর্ণভাবে বিকশিত নয়, তার চেতনা এবং আধ্যাত্মিকতা তার মধ্যে সম্ভাব্য অনেক পরিবর্তন সংঘটিত করতে পারে, তখনই বলতে হবে যে মানুষ অস্তিত্বশীল বিষয়। জেস্পার্স বিশ্বাস করতেন যে মানুষ হলো মুক্ত, স্বাধীন (free) কারন সে যেমন তার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে তার ইচ্ছানুযায়ী, আবার তেমনি তার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত না-ও করতে পারে তার ইচ্ছানুযায়ী। তবে মানুষের সাধারন প্রবনতা হলো তার নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে তার অস্তিত্বকে ভুলে থাকা, এবং নিজেকে চেতনাবিহীন তত্র-সত্তা হিসেবে গণ্য করা।

জেস্পার্স ধী (reason) এবং অস্তিত্বের মধ্যে বিপ্রতীপ সম্পর্ক দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেন যে অস্তিত্বহীন ধী অর্থহীন এবং শূণ্য, কারন অস্তিত্ব না থাকলে ধী থাকতে পারে না। অস্তিত্ব হলো ধী-এর আধার। অস্তিত্বশীল মানুষ যখন পূর্ণের বিকারগুলোর (তত্র-সত্তাগুলোর) সম্মুখীন হবে তখনই ধী তৎপর হয়ে উঠবে। কাজেই ধী-এর উপস্থিতির একটি শর্ত হলো মানুষের অস্তিত্ব। আবার ধী না থাকলে মানুষের অস্তিত্বও শূণ্য হয়ে পড়তো, অস্তিত্ব হতো অর্থহীন স্বপ্ন। তাছাড়া, ধী অস্তীত্বশীল বিবিক্ত মানুষসমূহের মধ্যে যোগসূত্র (communication) স্থাপন করে। জেস্পার্স বলেন যে এই যোগসূত্রও একপ্রকার সত্য (truth)। ধী যেসব বিষয়সমূহকে যোগসূত্রে আবদ্ধ করে তা সবই সীমিত। ধী কেবল সীমিত অস্তিত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব ধী-এর পরিধিকে অতিক্রম করতে পারে। মানুষের অস্তিত্ব ধী-এর যোগসূত্রে আবদ্ধ পূর্ণের বিকারগুলোর (modes) অবারণকে ভেদ করে পূর্ণের প্রতি ধাবিত হয়। সীমার বাঁধনকে সে ছিন্ন করে অসীমের দিকে ছুটে যায়। জেস্পার্স সত্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন—সীমিত বিষয়ের সত্য বা আপেক্ষিক সত্য এবং অসীমের সত্য। মানুষের গভীরতম ভাবনা হলো কেমন করে অসীমের সত্যে সে পৌঁছুতে পারবে। মানুষ মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে চাঁদকে ধরতে চায়, সীমিত হয়েও অসীমের সান্নিধ্য আকাঙ্খা করে। আর তাই তার সমস্ত

প্রচেষ্টা হয়ে পড়ে ব্যর্থ। তবু তার বারংবার প্রচেষ্টার বিরতি নেই। সীমার মাঝে সে থাকতে চায় না, তার অধ্যাত্মিক মৌলিক ও প্রকৃত স্বভাব তাকে অসীমের দিকে নিয়ে যেতে চায়। জেস্পার্স বলেন যে অসীমের প্রতি মানুষের এই আকর্ষন আমরা পাঁচটি ক্ষেত্রে দেখতে পাই যেখানে তার সীমাকে সে লঙ্ঘণ করতে চায়। এই পাঁচটি ক্ষেত্র হলো : (১) পরিসীমিত জগতে তার নিজের কৃত-কর্মের মধ্যেও সন্তুষ্টির অভাব; (২) সর্বব্যাপী নৈতিক আদর্শের (universal moral imperative) কাছে আত্মসমর্পন; (৩) জগৎ-প্রপঞ্চের অতীত এক অদৃশ্য ঐক্যের সঙ্গে সাযুজ্যের আকাঙ্ক্ষা; (৪) তার পূর্ব-জন্মের ঘটনা বা অস্তিত্ব সম্পর্কে এক অবর্ননীয় স্মৃতি; এবং (৫) অমরত্বে তার অগাধ বিশ্বাস। এই পাঁচটি বিষয় বিজ্ঞানের পরিধি-বহির্ভূত, কেননা এসব বিষয় মূর্ত নয় বা বিষয়গত নয়। জেস্পার্স-এর মতে দর্শনের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিৎ যথার্থ অস্তিত্বশীল এই মানুষ। যেহেতু মানুষ বিষয়গত নয় বা চেতনাহীন তত্র-সত্তা নয়, তাই সে হলো অমূর্ত। এরূপ অমূর্ত বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে না। মানুষ সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তা হবে বিষয়-বিহীন এবং মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান হবে প্রকৃতপক্ষে অ-জ্ঞান (non-knowledge)।

যে-অসীমের প্রতি মানুষ স্বীয় সীমাকে অতিক্রম করে ধাবিত হচ্ছে তাকে জেস্পার্স নাস্তি (Nothing) বলেছেন। জেস্পার্স এর মতে আমরা যাকে ঈশ্বর বলি তা প্রকৃতপক্ষে এই নাস্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। ঈশ্বর বলে সত্যিকারে কিছু নেই, আর তাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে কোন প্রমাণ থাকতে পারে না। জেস্পার্স বলেন, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, সে ঈশ্বরের ধারণা প্রকৃত ঈশ্বরের ধারনা নয় ("A proved God is no God.")। মানুষের অন্তরে যে সর্বব্যাপী নিঃশর্ত, আদেশ রয়েছে, তা-ই হলো প্রকৃত ঈশ্বরের আদেশ। কাজেই ঈশ্বর মানুষের অন্তরেই বাস করেন। এই অন্তরের ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই মানুষের পরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। এখানে জেস্পার্স ধর্মানুরাগী অস্তিত্ববাদী হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, অন্তরের ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার শক্তি মানুষের আছে। জেস্পার্স বলেন, জগৎ-রূপী অবভাসকে ঈশ্বরের প্রতীকী ভাষা হিসেবে বুঝতে হবে। তাহলে অন্তরের ঈশ্বরকে বুঝতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু এ-থেকে আমরা অবশ্যই বুঝতে চেষ্টা করবো না যে জেস্পার্স সেই পুরনো "আত্মানং বিদ্ধি"-র কথাই বলছেন। বরং তিনি বলেন যে "আত্মানং বিদ্ধি"-র কোন অর্থই হতে পারে না, কারন মানুষ কখনোই নিজেকে জানতে পারে না। মানুষ নিজেকে জানবে কী করে? মানুষের তো কোন সারবত্তা নেই, মানুষ তো কিছুই নয়—মানুষ শুধু স্বাধীনতা। মানুষকে কেবলমাত্র নঞর্থকভাবে জানা যেতে পারে। সে কী কী নয়, কেবলমাত্র তার পরিপ্রেক্ষিতেই সে নিজেকে জানতে পারে।

জেস্পার্স তাঁর বই *Philosophie*-এ দার্শনিক চিন্তার তিনটি সোপানের কথা বলেছেন : জাগতিক দার্শনিক চিন্তা, অস্তিত্বমূলক দার্শনিক চিন্তা, এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা। জাগতিক দার্শনিক চিন্তায় বস্তুগত বিষয়কে জানবার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষের অনুধাবন থেকে সামান্য (universal) এবং আবশ্যিকতাকে (necessity) জানতে হবে। দর্শন এখানে বিজ্ঞানের সীমারেখার দ্বারা সীমিত হবে। বিজ্ঞান অবভাসের অনুধাবন করে এবং অবভাসের জ্ঞান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় সোপানে অর্থাৎ অস্তিত্বমূলক চিন্তায় আমরা পূর্ণের মুখোমুখি মানুষের পরিস্থিতিকে বুঝতে চেষ্টা করবো। শেষ সোপানে মানুষকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হতে হবে এবং বুঝতে হবে যে সে সীমিত এবং অসীমের দ্বারা আবৃত (স্মরণ করা যেতে পারে ঈশোপণিষদের কথা : ''ঈশা বাস্যামিদং সর্বং.....'')। এরূপ বোধ এলেই মানুষ তার সীমারেখাকে অতিক্রম করে অসীমের মুখোমুখি হতে পারবে। মানুষ তখন তার জাগতিক নিরাপত্তাহীনতাকে, নৈরাশ্যকে, দ্বন্দ্বকে, পাপবিদ্ধতাকে এমনকি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবে। জেস্পার্স-এর মতে এই শেষ স্তরেই হলো দার্শনিক চিন্তার শেষ পর্যায়।

জেস্পার্স-এর দর্শন হয়তো ব্যবহারিক জগতে মানুষের শান্তির অভাববোধ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। জেস্পার্স, কিয়ার্কেগার্ড, শেলিং (Schelling) এবং নিট্‌শে-এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও এসব দার্শনিকবৃন্দ থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কিয়ার্কেগার্ড-কে তিনি অন্যতম অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বললেও কিয়ার্কেগাড-এর দর্শনের নঞর্থক দিকগুলোকে তিনি অগ্রাহ্য মনে করেছেন। কিয়ার্কেগার্ড কৃচ্ছ্রবাদী দার্শনিক ছিলেন—তিনি জাগতিক সুখ, সাংসারিক জীবন এমনকি বৈবাহিক সম্পর্ককেও অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু জেস্পার্স-এর দর্শন সদর্থক (positive), নঞর্থক (negative) নয়। জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি থেকে তিনি মানুষকে দূরে সরে থাকতে বলেননি। তাঁর মতে জাগতিক পরিবেশ থেকেই মানুষকে এই পরিবেশ বা পরিস্থিতিকে (situation) অতিক্রম করতে হবে এবং যথার্থ মানুষ হতে হবে। জেস্পার্স জগতে আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব দেখতে পেয়েছেন। মানুষকে এই আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে হবে। এই দ্বন্দ্ব ডারউইন (Darwin)-এর জীব-জগতের দ্বন্দ্ব নয়। ডারউইন বলেছিলেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে। কিন্তু জেস্পার্স বলেছেন আত্মার (চেতনা) সঙ্গে পূর্ণের দ্বন্দ্বের কথা। এই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে বিকশিত করতে হবে।

অস্তিত্ববাদের প্রতি আস্থা থাকা সত্ত্বেও অস্তিত্ববাদের কোন কোন প্রবণতার জন্য জেস্পার্স আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমত, অস্তিত্ববাদ বহির্জগৎ থেকে

দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে অর্ন্তমুখী করতে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে। বলা হচ্ছে, আত্মাই সবকিছুর কেন্দ্রস্থল, আত্মার ভেতর দিয়েই সবকিছুকে জানতে হবে। অথচ আত্মাকে বলা হয়েছে শূণ্য, উদ্দেশ্য-বিহীন এবং মৃত্যুর দ্বারা পরিসীমিত। অস্তিত্ববাদের এরূপ চিন্তাধারা মানুষকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক করে তুলবে। জেস্পার্স এ-বিষয়ে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, অস্তিত্ববাদ তার পূর্বসূরী দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাকে ভ্রান্ত বলেছে, মূল্যহীন বলেছে। কিন্তু জেস্পার্স বলেন যে, যেকোন দর্শনের মূল্যায়ন করতে হবে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সাধারণ চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে। কাজেই পূর্বসূরী দর্শনগুলোকে অর্থহীন বলে গণ্য করা যায় না। তিনি বলেন, প্রতিটি দার্শনিক চিন্তার মধ্যেই আংশিক সত্য লুকিয়ে আছে। তিনি আরও বলেন যে পূর্বসূরী দার্শনিক চিন্তা ধারাগুলোর মধ্যে অস্তিত্ববাদের কিছু কিছু রেখাচিত্র রয়েছে। জেস্পার্স ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে ব্যক্তি-বর্গের ভিন্নভিন্ন রকমের চিন্তা থাকতে পারে, তবে এসব বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, যাতে আমরা একটি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তার ভাতৃসঙ্ঘ স্থাপন করতে পারি।

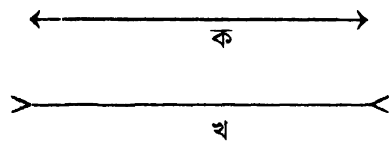
মরিস মার্লু-পন্টি

ফরাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মরিস মার্লু-পন্টি-এর (Maurice Merleau-Panty) (১৯০৮-১৯৬১) জন্ম হয় ফ্রান্সের রোশেন ফোর্টসুর-মের-এ। কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতা করার পর তিনি কলেজ দ ফ্রান্স-এ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি লায়ন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের (Professor) পদে যোগদান করেন। তিনি লভন (Lyon) এবং সোঁরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছিলেন। সার্ত্র (Jean-Paul Sartre) এবং সিমোঁ দ বুভার-এর (Simon de Bouvoir) সহযোগিতায় তিনি *Les Temps modernes* নামক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মৌল-মার্ক্সবাদী, কিন্তু উত্তরকালে তিনি মার্ক্সবাদ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে পড়েন। ফলে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাসের একটি মাত্র ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। তাঁর মতে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হয় সমাজের বহুমুখী প্রবণতা এবং অভিপ্রেতের জন্য। তাঁর প্রধান প্রধান পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে : *The Structute of Behaviour (১৯৪২), Pheneomenology of Perception (১৯৪৫), Sense and Nonsense (১৯৪৮), The Adventures of Dialectics (১৯৫৫), The Visible and the Invisible (১৯৬৪)* ইত্যাদি। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *Humanism and Terror, In Praise of Philosophy, The Primacy of Perception (১৯৬৪)* ইত্যাদি।

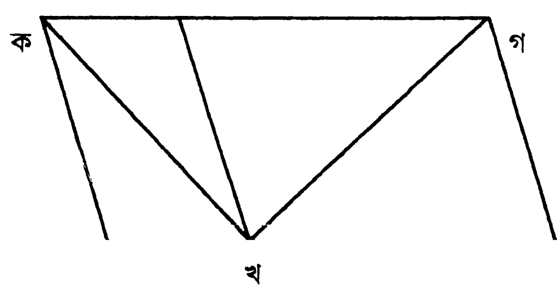
মার্লু-পন্টি সার্ত্র-এর বন্ধু ছিলেন। সার্ত্র-এর মতো তীক্ষ্ণ কল্পনা-শক্তি তাঁর না থাকলেও তিনি সার্ত্র-এর চেয়ে অস্তিত্ববাদের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাবান ছিলেন। এজন্য মেরী ওয়ার্নক (Mary Wornock) তাঁর বই *Existentialism* এ মার্লু পন্টি-কে দার্শনিকদের অস্তিত্ববাদী-দার্শনিক (philosophers' Existentialist) বলেছেন। সার্ত্র মার্লু-পন্টি-র চেয়ে বড় ছিলেন এবং সার্ত্র-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *Being and Nothingness* মার্লু-পন্টির-র অস্তিত্ববাদের ওপর লেখা প্রধান গ্রন্থ *Phenomenology of Perception*-এর পূর্বে লেখা হয়েছিলো। তথাপি সার্ত্র-এর পূর্বে মার্লু-পন্টি সম্পর্কে আলোচনা করার একটি কারন এই যে মার্লু-পান্টি-র দর্শনকে সাধারন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক আলোচনার ভূমিকা হিসেবে, বিশেষ করে সার্ত্র-এর দর্শনের ভূমিকা হিসেবে, গণ্য করা যেতে পারে। মার্লু-পন্টি হুসের্ল-এর দ্বারা এবং গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভুতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেহ-মনের দ্বৈতবাদকে তিনি অস্বীকার করেছেন। প্রান্তিক বা চরম বস্তুবাদ (materialism) এবং চরম বাস্তববাদ (extreme realism) অনুযায়ী জগৎ নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল, জগৎ মন-সাপেক্ষ অথবা চেতনা-সাপেক্ষ নয়। আবার চরম ভাববাদীগণের মতে জগৎ সম্পূর্ণভাবে চেতনার সৃষ্টি। মার্লু-পন্টি এই দুপ্রকার প্রান্তিক বা চরম মতবাদকেই অগ্রাহ্য মনে করেছেন। তিনি বলেন যে প্রত্যক্ষের বিষয় প্রকৃতপক্ষে প্রহেলিকাময় (enigmatic)। তিনি তাঁর *Phenomenology of Perception* নামক গ্রন্থে প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ করেছেন এবং এর মাধ্যমেই অস্তিত্ববাদে উপনীত হয়েছেন।

গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানীগনের মতে প্রত্যক্ষের সরলতম (simplest) বিষয় হলো একটি রঙ্-এর প্রেক্ষাপটে অপর একটি রঙ-এর আকার (form)। এই আকার চেতনায় উপস্থিত থাকে। গেষ্টল্ট-মনোবিজ্ঞানীদের এরূপ সিদ্ধান্ত মার্লু-পন্টি গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও বলেছেন যে আমরা যখন কোন জিনিস দেখি, তখন সর্বপ্রথম ঐ জিনিসটিকে একটি বিশেষ রঙ্-এর আকার হিসেবে দেখি, আর এই আকারটিকে দেখি অন্য একটি রঙ্-এর আকারের প্রেক্ষাপটে। বই-এর তাকে (shelf) একটি বই দেখতে পাচ্ছি। প্রথমেই বুঝতে পারা যায়নি যে ওটি একটি বই, শুধু দেখা যাচ্ছে যে বই-এর গোটা তাকটি ফিকে রঙ্-এর আর তার মাঝখানে রয়েছে গাঢ় নীল রঙ্-এর একটি বিশেষ আকার। পরক্ষণে বোঝা গেলো যে ঐ বিশেষ আকারটি একটি বই। পূর্বে মনোবিজ্ঞানীগণ এবং দার্শনিকগণ বলেছিলেন যে প্রত্যক্ষের প্রাথমিক বা মূল উপাদান হলো 'বিশুদ্ধ অনুভূতি' (pure sensation) অথবা 'অনুভূতির পরমাণু' (atoms of feeling)। তাঁরা বলতেন যে একটি বিশেষ বস্তুকে দেখার অর্থ এই যে ঐ বস্তুর অসংখ্য অংশের অসংখ্য অনুভূতি লাভ করা।

আমাদের চেতনা এই অসংখ্য অনুভূতিগুলোকে একত্র করে ঐ বস্তুটির সামগ্রিক প্রত্যক্ষণ সম্ভব করে তোলে। কিন্তু মার্লু-পন্টি বলেন যে কোন বস্তুকে আমরা কোন একটি আকার ভিন্ন প্রত্যক্ষ করতে পারি না। আকার রয়েছে চেতনায় বা বুদ্ধিতে। সুতরাং বুদ্ধির হস্তক্ষেপ ভিন্ন প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। আর এ-কারনেই তিনি বলেছেন যে অনুভূতিতে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রন রয়েছে ("sensory processes are not immune to central influences.")। প্রত্যক্ষণের বিষয়ে তিনি তিনটি মূল নীতি বা তত্ত্বের কথা বলেছেন। প্রথমত, প্রতক্ষের উপাত্তসমূহের সঙ্গে বস্তুর সরাসরি সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষণের সময় চেতনায় বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য না-ও থাকতে পারে। যেমন, মুলোর-লীয়র ভ্রম (Muller-Lyer illusion) বা স্যাণ্ডার-সমান্তরাল-ক্ষেত্রের ভ্রমে (Sander Parallelogram illusion) দুটো বিষয় প্রকৃতপক্ষে সমান হলেও অসমান দেখায়।



ম্যুলার-লীয়র ভ্রম



স্যান্ডার-সমান্তরালক্ষেত্রের ভ্রম

মূল্যের-লীয়র ভ্রমে 'ক' এবং 'খ' সমান দীর্ঘ, অথচ 'খ'-কে 'ক'-এর চেয়ে অধিক দীর্ঘ বলে মনে হয়। স্যাণ্ডার-সমান্তরাল ক্ষেত্রের ভ্রমে 'ক-খ' ও 'খ-গ' সমান দৈর্ঘের, অথচ 'ক-খ'-এর চেয়ে 'খ-গ'-কে অধিক দীর্ঘ বলে মনে হয়। এরূপ ভ্রম প্রমান করে যে চেতনায় বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য না-ও থাকতে পারে। তৃতীয়ত, এমনকি প্রাথমিক প্রত্যক্ষণেও (elementary perception) আমরা বস্তুর যতটুকু প্রত্যক্ষণ করি তার চেয়ে বেশী প্রত্যাশা করি (expect) বস্তুটি সম্পর্কে।

কোন বস্তুর আংশিক প্রত্যক্ষ হলেই আমরা ঐ বস্তুর অপরাপর অংশ কেমন হতে পারে, এ-সম্পর্কে কিছু একটা প্রত্যাশা করে থাকি। কাজেই মার্লু-পন্টি বলেন যে প্রাথমিক প্রত্যক্ষণও কেবলমাত্র অনুভূতি নয়। তাঁর মতে দৃষ্টিবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী (empiricist) দার্শনিকদের ভুল এখানে যে তাঁরা অনুভূতি-উপাওগুলোকেই বস্তু বলেছেন। পক্ষান্তরে, মার্লুপন্টি বলেন যে বস্তু আংশিকভাবে আমাদের চেতনার সৃষ্টি।

মার্লু-পন্টির মতে মানুষের আচরনের (behaviour) তিনটি স্তর বা সোপান আছে—ভৌতিক, জৈবিক ও মানসিক। ভৌতিক বিষয় না থাকলে জৈবিক বিষয় থাকতে পারতো না, আর তাই ভৌতিক বিষয় হলো জৈবিক বিষয়ের শর্ত বা ভিত্তি। ভৌতিক ও জৈবিক বিষয়ের সম্পর্ক এরূপ যে জৈবিক বিষয়কে ভৌতিক বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তেমনিভাবে জৈবিক বিষয় হলো মানসিক বিষয়ের শর্ত বা ভিত্তি এবং তাই মানসিক বিষয়কে জৈবিক বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অবভাস-বিজ্ঞানে আমরা দেখেছি যে চেতনার বস্তুর প্রতি ধাবিত হবার প্রবণতা (intention) রয়েছে। চেতনা বা মনকে যদি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার না যায়, তবে মার্লু-পন্টিকে অনুসরন করে আমরা অবশ্য বলতে পারি যে দেহ-ও বস্তুর প্রতি ধাবিত হতে চায়, অর্থাৎ বস্তুর প্রতি ধাবিত হবার প্রবণতা দেহেরও আছে। মার্লু-পন্টি বলেন যে সমস্ত প্রকার অভিপ্রায় বা প্রবণতার মূল কেন্দ্রস্থল হলো দেহ। আবার, বস্তুর সঙ্গে দেহের অবস্থানের একপ্রকার সম্পর্ক রয়েছে—দেহ বস্তুর ডানে অথবা বাঁয়ে অথবা অন্য কোন দিকে অবশ্যই থাকবে। আবার দেহের এক প্রকার অবস্থার সময়ই আমরা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে থাকি (যেমন, দৃষ্টি-প্রত্যক্ষণের সময় আমাদের চোখ খোলা থাকবে এবং বস্তু আমাদের চোখের সামনে থাকবে, ইত্যাদি)। কাজেই আমাদের প্রত্যক্ষণ আমাদের দেহের বিশেষ ভঙ্গি, অবস্থান অথবা অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তির দেহের বিশেষ ভঙ্গি, অবস্থান অথবা অবস্থা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হবে। তাই প্রত্যক্ষকে সার্বিকীকরণ করা (universalise) যায় না—প্রত্যক্ষ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। দেহের এই বিশেষ পরিস্থিতির (অথবা অবস্থান অথবা অবস্থা) একটি কারন এই যে এতে কিছু গৃহীত (accepted) এবং পূর্ব-মূল্যায়িত (pre-evaluated) অর্থ রয়েছে। এই অর্থগুলোও প্রত্যক্ষের শর্ত আর এই অর্থ সমূহের দ্বারাও মানুষের স্বাধীনতা সীমিত। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন একটি মতবাদে বিশ্বাসী হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির ঐ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ বিশেষ রকমের হতে পারে। একবার আফ্রিকার কোন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর এক মনোবিজ্ঞানী এরূপ একটি পরীক্ষা চালান। ঐ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিছু

খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিল। মনোবিজ্ঞানী ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে একটি অস্পষ্ট (amorphus) ছবি রাখেন। দেখা গেলো যেসব ছাত্র-ছাত্রী খৃষ্টান নয় তারা ছবিটিকে গাছ, স্তম্ভ, ইত্যাদি হিসেবে ব্যাখ্যা করছে, আর খৃষ্টান ছাত্র ছাত্রীরা একে ক্রুশ (cross) হিসেবে ব্যাখ্যা করছে। কাজেই কোন বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস থাকলে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বিশেষভাবে প্রভাবিত হতে পারে। কাজেই মার্লু-পন্টি যথার্থই বলেছেন যে ব্যক্তির গৃহীত এবং পূর্ব-মূল্যায়িত অর্থগুলো ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা এবং ক্রিয়াকে (বা আচরনকে) সীমিত করে থাকে।

মার্লু-পন্টি তাঁর দর্শনকে অস্তিত্ববাদী অবভাস-বিজ্ঞান (existentialist phenomenology) বলেছেন। তিনি মনে করেন যে অবভাস-বিজ্ঞান থেকে অস্তিত্ববাদকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, কোন না কোনভাবে প্রত্যক্ষের ওপরই দর্শন নির্ভরশীল। আর অবভাস-বিজ্ঞানেব একটি মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলো প্রত্যক্ষ। কাজেই মার্লু-পন্টি অবভাস-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেই অস্তিত্ববাদে উপনীত হয়েছেন। আর তাই তিনি তাঁর দর্শনকে বলেছেন অস্তিত্ববাদী অবভাস-বিজ্ঞান। অবভাস-বিজ্ঞানকে সমর্থন করতে গিয়ে অপরাপর অবভাস-বিজ্ঞানীদের মতোই তিনি বিজ্ঞানকে (Science) অগ্রাহ্য মনে করেছেন। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ নির্ভব। আবার প্রত্যক্ষণ ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিজ্ঞানও অবশ্যই ব্যক্তি সাপেক্ষ। আর এ-থেকে বলা যায় যে ব্যক্তিই সমস্ত জ্ঞানের সর্বব্যাপী (absolute) উৎস স্থল। মার্লু-পন্টি বলেন ব্যক্তি যে কেবলমাত্র একটি জীব নয়, অথবা একটি চেতনা নয়, অথবা জীব-বৈজ্ঞানিক, সমাজ-বৈজ্ঞানিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক উপাদানের সমষ্টি নয়। তাঁর মতে ব্যক্তি হলো সর্বব্যাপী এবং মুক্ত। প্রথাগত আচরনের আধার হিসেবেও ব্যক্তিকে গণ্য করা যায় না, কেননা ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে প্রথাগত আচররনকে বা বিধি-নিষেধকে হয় গ্রহন করছে, নয়তো করছে না। কিয়ার্কেগার্ড বলেছিলেন যে ব্যক্তি ধর্ম ও নৈতিকতার সর্বব্যাপী উৎস, কারন ব্যক্তি হলো প্রত্যক্ষের উৎস। প্রত্যক্ষণের সময় ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে না, প্রত্যক্ষণে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা পূর্ব (a priori) বিষয়ে প্রভাব থাকে। মার্লু-পন্টি-র *Phenomenology of Perception*-এর মূল উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-পূর্ব বা জ্ঞান-পূর্ব মানসিক জগৎ-কে উদঘাটিত করা। তিনি বলেন জ্ঞান হতে হলে প্রথমেই প্রত্যক্ষণ থাকতে হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষণ থাকলেই জ্ঞান হবে, এমন নয়। যেমন, শিশু প্রত্যক্ষ করছে, কিন্তু তার জ্ঞান নেই। তবে প্রত্যক্ষণ ভিন্ন জ্ঞান সম্ভবই নয়। মার্লু-পন্টি তাই প্রত্যক্ষের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করে এর প্রকৃতি জানতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো বর্ণনামূলক, ব্যাখ্যামূলক নয়। প্রত্যক্ষের বিষয়কে জানতে হলে বন্ধনীকরণ পদ্ধতি

অবলম্বন করতে হবে। আর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ী ও বিষয়ের সম্পর্ককে জীবনমূলকভাবে দেখতে হবে—ভাবতে হবে যে ব্যক্তি একটি জীবনমূলক বিশ্বে (*Lebenswelt*) রয়েছে। অর্থাৎ ভাবতে হবে যে বিশ্বের সবকিছুই ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে কোন না কোনভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে অবস্থান করছে। জগৎ-টি একটি অর্থহীন বিশুদ্ধ বিষয় নয়। পক্ষান্তরে, সত্য কেবলমাত্র ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করে না। ব্যক্তি একটি জগতে রয়েছে। কাজেই সত্য ব্যক্তি ও জগতের সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান করছে। এজন্যই মার্লু-পন্টি বলেন যে ব্যক্তি যদি শুধু নিজেকেও জানতে চায়, তাহলেও তাকে 'বিশ্বের-মধ্যে-সে উপস্থিত' (being-in-the-world)—এমনিভাবে নিজেকে ভাবতে হবে এবং জানতে হবে। 'বিশ্বের-মধ্যে-উপস্থিত' থাকার অর্থ হলো একপ্রকার অর্থপূর্ণ বিশ্বে উপস্থিত থাকা। ব্যক্তিকে বস্তুতে অর্থ সংযোজন করতে হবে (অবশ্য মানুষ করেও থাকে তা)। মার্লু-পন্টি বলেন যে এই অর্থ-সংযোজন অনেকখানি নির্ভর করে মানুষের দেহের অবস্থার ওপর অথবা দেহের বৈশিষ্টের ওপর। শ্লাইডার (Schileider) নামক এক মানসিক রোগীর প্রত্যক্ষণকে বিশ্লেষণ করেই মার্লু-পন্টি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

শ্লাইডার-এর দৃষ্টি-সংক্রান্ত এবং শরীর-সংক্রান্ত একপ্রকার অসমর্থতা ছিল। তার সামনে একটি ঝর্না-কলম উপস্থিত করলে সে এরূপ বলতো : "এটি একটি কালো, উজ্জ্বল, লম্বা বস্তু—....লাঠির মতো........একটি যন্ত্রের মতো........। পক্ষান্তরে একটি সুস্থ ব্যক্তির সামনে কলমটি ধরলে সে দেখেই বলতে পারে : "এটি একটি কলম এবং এটি দিয়ে লেখা যায়।" শ্লাইডারের ক্ষেত্রে একটু একটু প্রত্যক্ষণ হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে বস্তুর অর্থ ফুটে উঠছে। আর সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে কলমটির প্রত্যক্ষণ ঐ বস্তুর অর্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মার্লু-পন্টি বলেন যে অবভাস-বৈজ্ঞানিকদের অবভাস-সম্পর্কে জ্ঞান শ্লাইডার-এর জ্ঞানের মতো ধীরে ধীরে হয়ে থাকে, কিন্তু স্বাভাবিক প্রত্যক্ষণ (বা মার্লু-পন্টির মতে প্রত্যক্ষণ) অর্থ-সমন্বিতভাবে হয়। তিনি বলেন, প্রকৃত বা স্বাভাবিক প্রত্যক্ষণ সর্বদাই অর্থ-সমম্বিত প্রত্যক্ষণ। মার্লু-পন্টির এ-কথার গুরুত্ব অপরিসীম। শ্লাইডার-এর এমন অস্বাভাবিক প্রত্যক্ষণ হয়েছে তার দৈহিক অস্বাভাবিকতার জন্য। কাজেই দৈহিক শর্তাবলির ওপর প্রত্যক্ষণ নির্ভরশীল। অর্থাৎ বলা যায় যে আমরা দেহ দিয়ে প্রত্যক্ষণ করি। জাগতিক বস্তু-সমূহ কতকগুলো যন্ত্র মাত্র (tool), এগুলোকে আমরা দেহের সাহায্যে ব্যবহার করি। বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ জাগতিক বস্তুর সাযুজ্য কেমন হতে পারে, এর ওপরই আমাদের প্রত্যক্ষণ এবং বস্তুর অর্থবোধ নির্ভর করছে। নিজেদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের একপ্রকার পূর্ব-জ্ঞান (pre-knowledge) রয়েছে। এই পূর্ব-জ্ঞানের সঙ্গে জগতের সম্পর্কই মার্লু-পন্টি আবিষ্কার

করতে চেয়েছিলেন। দেহের পরিধির বা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হতে পারে কোন কোন সময় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে। যেমন, কোন ব্যক্তির মাথার টুপিতে পালক গুঁজে থাকলে দরজার ভেতর দিয়ে কেমন করে ঢুকতে হবে তা যেন সে পূর্বেই অনুমান করতে পারে। দেহের সঙ্গে জগতের এরূপ সম্পর্ক হলো ঐ ব্যক্তির পূর্ব-জ্ঞান। আবার দেহের অভ্যন্তরে যেমন হৃদয় থাকে, মানুষ তেমনি যেন জগতের অভ্যন্তরে রয়েছে। হৃদয় যেমন সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন করছে, মানুষও তেমেনি জগতের অভ্যন্তরে থেকে প্রতিনিয়ত জগৎ-কে অর্থপূর্ণ করে তুলছে। দেহে রক্ত-সঞ্চালন যেমন হৃদপিণ্ডের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভব করে, তেমনি জগতে অর্থ-সংযোজন বা অর্থ-ন্যাস নির্ভর করছে মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। মার্লু-পন্টি বলেন, ব্যক্তির চেতনা কখনোই বিশুদ্ধ নয়, কেননা চেতনা দেহের ওপর নির্ভরশীল। তেমনিভাবে বহির্বিশ্বও কখনো বিশুদ্ধ নয়, কারন বিহর্বিশ্ব রয়েছে ব্যক্তির কাছে একটি অর্থপূর্ণ বিষয় হিসেবে। এমনিভাবে মার্লু-পন্টি ব্যক্তি ও জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছেন।

আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হলো, এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির সম্পর্ক মার্লু-পন্টি কেমন করে ব্যাখ্যা করেছেন? এখানে মার্লু-পন্টি-র উত্তর সহজ এবং সরাসরি। তিনি বলেন, আমার চেতনা যদি আমার দেহে অবস্থান করে, তবে অপর ব্যক্তির দেহ প্রত্যক্ষ করেই আমি জানতে পারি যে ঐ দেহেও চেতনা রয়েছে। আমার দেহ থেকে যেমন আমার চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না, অপর ব্যক্তির দেহ থেকেও তেমনি অপর ব্যক্তির চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কাজেই এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির সম্পর্কও দেহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। দেকার্ত (Descartes) দেহ ও মনকে (চেতনাকে) পৃথক করে দেখেছেন। এতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, আর হয়েছে অহং কেবলংবাদের (solipcism) সৃষ্টি। মার্লু-পন্টি-র এই বক্তব্যে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। তিনি বললেন, অপর ব্যক্তির দেহ প্রত্যক্ষ করে আমরা অনুমান (inference) করি না যে ঐ দেহেও চেতনা রয়েছে, বরং এরূপ অনুমানের পূর্বেই আমরা তা বুঝতে পারি। শিশু নিজের চেতনা এবং অপরের চেতনা না জেনেই অপরের আচরণ অনুকরণ করে থাকে অপর ব্যক্তিকে তার নিজের শ্রেণীভুক্ত জীব (মানুষ) ভেবে। এমনিভাবে আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (scientific knowledge) লাভের পূর্বেই বুঝে থাকি যে আমরা আমাদের মতো অপরাপর ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত। জগতে স্বীয় পরিস্থিতি (situation) বুঝতে হলে তাই ভাবতে হবে যে আমরা একটি সামাজিক (মনুষ্যবর্গের) পরিবেশে আছি। এজন্যেই মার্লু-পন্টি বলেন যে দর্শন অর্থে প্রধানত সমাজ-দর্শনকে বুঝতে হবে।

মার্লু-পন্টি যে আত্মার বা অস্তিত্বের (cogito) অনুসন্ধান উৎসাহী তাহলো বুদ্ধি পূর্ব বা জ্ঞান-পূর্ব (pre-reflective)। এতে আছে আংশিক চেতনা বা অবশিষ্ট চেতনা (vestigial consciousness), যাকে জ্ঞান-পূর্ব চেতনা বলা যেতে পারে। এই চেতনা ভাষা-পূর্বও বটে, কেননা ভাষা ব্যবহারের পূর্বেই এই চেতনা আমাদের থাকে, অথবা এই চেতনায় অবস্থিত বিষয়কে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শিশু শিলাবৃষ্টি দেখে বলছে : "শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।" কাকে শিলাবৃষ্টি বলে তা জানবার পূর্বেই সে শিলাবৃষ্টিকে জানছে এবং জানছে যে শিলাবৃষ্টি একটি বিষয়, আর সে নিজ হলো এর বিষয়ী। এখানে শিশুটি জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন জগতের ব্যাখ্যা দিচ্ছে জগতে অর্থ সংযোজন করছে, এবং বলছে "শিলাবৃষ্টি হচ্ছে"। এরূপ জ্ঞান-পূর্ব চেতনার আধার হলো দেহ। দেহের (এখানে চক্ষুর) সাহায্যেই সে শিলাবৃষ্টির জ্ঞান-পূর্ব, ভাষাপূর্ব অভিজ্ঞতা (প্রত্যক্ষ) পাচ্ছে। এমনিভাবে সে বিষয়ী হিসেবে নিজের অস্তিত্বকে বুঝতে পারছে। কাজেই মার্লু-পন্টি বলেন যে দেহ ভিন্ন আত্মা বা অস্তিত্ব সম্ভব নয়। দেকার্ত-এর দেহ বা জগৎ সম্পর্কে সন্দেহ অমূলক। কারন অস্তিত্ব থেকে দেহকে (এবং জগৎ-কে) বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যা হোক, ব্যক্তির অস্তিত্ব বলতে এই অবশিষ্ট (vestigial) চেতনাকেই বুঝিয়েছেন মার্লু-পন্টি। তাঁর অস্তিত্ববাদের মূল বক্তব্যই রয়েছে এখানে। অবশিষ্ট-চেতনার প্রকাশ ঘটে প্রত্যক্ষে। আবার প্রত্যক্ষ কালে (time) ঘটে থাকে, যে কাল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হতে পারে। অতীতের প্রত্যক্ষ দেহে (স্মৃতিরূপে) উপস্থিত থাকে, আর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর প্রত্যক্ষ দেহ (যাতে চেতনা রয়েছে) সৃষ্টি করে থাকে। কাজেই দেহ না থাকলে প্রত্যক্ষণ এবং জগতের বর্ণন সম্ভব হতো না।

মার্লু-পন্টি অস্তিত্বের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি কারণ-কার্য-অনুবন্ধকে (causatity) অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একটি বিষয় যদি অপর একটি বিষয়কে প্রভাবিত করে, অর্থাৎ দুটো বিষয়ের মধ্যে যদি কারন-কার্য-অনুবন্ধ থেকে থাকে, তাহলে দুটো বিষয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকবে। যেমন, দেশলাইর কাঠি ঘষে আগুণ জ্বালানো হলো। এখানে দেশলাইর কাঠি এবং আগুণ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এদুটো পরস্পর বিচ্ছেদ্য। কিন্তু অস্তিত্ব এবং জগতের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই— এদুটো পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কাজেই এদুটোর মধ্যে কোন কারন-কার্য-অনুবন্ধ নেই, থাকতে পারে না। আর অস্তিত্ব যদি কারন-কার্য-অনুবন্ধের দ্বারা পরিসীমিত না হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে যে অস্তিত্ব স্বাধীন এবং মুক্ত। যেটুকু বন্ধন আমরা জীবনে অনুভব করি তা-ও আমাদের অস্তিত্বের স্বাধীনতাই ঘোষণা করছে, প্রমাণ করছে। কারন স্বাধীনতা আছে বলেই তো কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা স্বাধীন নই। ভাব আছে বলেই মাঝে মাঝে অভাব বোধ হয়। এক সময়

মার্লু-পন্টি মার্ক্সবাদ এবং কম্যুনিজম-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল-মন্ত্র তাঁকে বেশীদিন কম্যুনিজম-এর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে থাকতে দেয়নি। তাঁর পুস্তক *Humanism and Terror*-এ তিনি বিপ্লব এবং দায়িত্ববোধের মধ্যে এক অপূরণীয় ফাটল দেখতে পেয়েছেন।

পল্ টিলিক

দুটো বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে এবং কৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতার যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছিলো, তা-ই পল্ টিলিক-কে (Paul Tillick : ১৮৮৬-১৯৬৫) অস্তিত্ববাদী দার্শনিকে পরিণত করেছিলো। ইভান জেলিক্যাল লুথারান চার্চে তিনি দীক্ষিত ছিলেন এবং এর ফলস্বরূপ তিনি ধর্মমূলক অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৮৬-এ জার্মানীর স্টারসেভ্ ডেলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বার্লিন, টুবিনগেন, হেল এবং ব্রেসলু শহরে শিক্ষা গ্রহন করার পর তিনি বার্লিন, মারবুর্গ, ড্রেসডেন লেইপসিগ ও ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। নাৎসী শাসনকালে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত চিকাগো এবং হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। টিলিক ইংরেজী এবং জার্মান উভয় ভাষাতেই পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর প্রধান রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে : *The Religious Situation (১৯৩২), The Interpretation of History (১৯৩৬), The Shaking of the Foundations (১৯৪৮), তিনখণ্ডে প্রকাশিত Systematic Theology (১৯৫১-১৯৬৩), The Courage to Be (১৯৫২), Dynamics of Faith (১৯৫৭), Theology of Culture (১৯৫৯), Christianity and the Encounter of the World Religious (১৯৬৩) এবং Morality and Beyond (১৯৬৩)*।

টিলিক খৃষ্টধর্মের দ্বারা প্রভূত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। ধর্ম যেমন বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করে, দর্শনও তেমনি মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। ধর্ম যেমন পরমতত্ত্বকে জানতে চায়, দর্শনও তেমনি পরমতত্ত্বকে জানতে আগ্রহী। আবার মূল্যতত্ত্ব (axiology) উভয় বিষয়ই আলোচনা করে থাকে। তবে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। দর্শনের সিদ্ধান্তও সার্বিক বা সামান্য। দর্শনের পদ্ধতি যৌক্তিক; আবেগ বা অনুভূতির স্থান এতে নেই। পক্ষান্তরে, ধর্মীয় আলোচনা প্রধানতঃ অস্তিত্বমূলক। এখানে সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনা পরস্পর সাহায্যকারী। টিলিকের ধর্মীয় আলোচনা অস্তিত্বমূলক। ১৯৫১-এ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Systematic Theology*-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে তিনি খৃষ্টধর্মের

বিশ্বাসের অভ্যন্তরে থেকেই অস্তিত্বের (being) বিশ্লেষণ করেন। পূর্ণ-অস্তিত্বকে (Being) টিলিক ঈশ্বর বলেছেন। এই ঈশ্বর ধর্মের ঈশ্বরের চেয়েও ব্যাপক। টিলিকের দর্শনে প্রতীক (symbol) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি চিহ্ন (sign) ও প্রতীকের মধ্যে প্রভেদ করেছেন। চিহ্ন ও প্রতীক উভয়ই কোন বস্তু অথবা বিষয়কে বোঝায়। তবে চিহ্ন যে কোন রকমের হতে পারে। যে বিষয়ের চিহ্ন তার সঙ্গে চিহ্নের কোন মিল না-ও থাকতে পারে। যেমন, রাস্তায় লাল আলো দেখামাত্র গাড়ি থেমে যায়। এখানে লাল আলো থেমে যাবার চিহ্ন। কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলেই নীল আলোকে থেমে যাবার চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতে পারতাম। পক্ষান্তরে, প্রতীক যে বস্তুর সে বস্তুর বৈশিষ্ট্য সে বহন করে (participates in)।

টিলিক-এর ধর্মবিশ্বাসে নতুনত্ব, অভিনবত্ব আছে। তিনি বলেন যে কেউ যদি কোন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে এবং এ বিষয়টি যদি তার অন্য সবকিছুর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তার কাছে, তাহলে এই অত্যধিক অভিনিবেশের বিষয়টিই ঐ ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর-স্বরূপ। তিনি বলেন, ঈশ্বর কোন ব্যক্তি বা বিষয় নয়। জগতের সৃষ্টি-কর্তা হিসেবেও ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ঈশ্বর এক এক ব্যক্তির কাছে এক এক রকম। সেই বিষয়ই হলো ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর-স্বরূপ যে বিষয়টি ব্যক্তির সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে অথবা যে বিষয়ে ব্যক্তি অভিনিবিষ্ট থাকে। টিলিকের মতে কোন বিষয়ে অত্যধিক অবিনিবিষ্ট থাকা হলো ধর্মমূলক। এরূপ অভিনিবিষ্ট থাকাকে কেবলমাত্র প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। সাধারণ ভাষার মাধ্যমে এরূপ অভিনিবেশকে প্রকাশ করা যায় না। টিলিক-এর দার্শনিক চিন্তায় যেমন নিট্‌শে, হুর্সেল ও হাইডেগার-এর প্রভাব আছে, তেমনি আছে গূঢ়-মনোবিজ্ঞান (depth psycholotgy), অস্তিবাদ এবং নব্য স্কলাস্টিক দর্শনের। তাঁর 'চরম-অভিনিবেশের' (ultimate concern) ধারণার জন্যই হয়তো অনেকে মনে করেন যে টিলিক ধর্মের কথা বললেও প্রকৃপক্ষে তিনি ছিলেন একজন গুপ্ত অধার্মিক (crypto atheist) ব্যক্তি।

অস্তিত্ববাদের দিক থেকে টিলিক-এর *The Courage to Be* গ্রন্থখানি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ-গ্রন্থে তিনি মানুষের উদ্বেগের (anxiety) কথা বলেছেন। এমনকি দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যুগকে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার 'উদ্বেগের যুগ' বলেছেন। উদ্বেগ হলো নাস্তি সম্পর্কে (about non-being) অস্তিত্ববাদী ভাবনা। মানুষের অস্তিত্বের অবসান চিরদিনই হয়ে এসেছে—মানুষ চিরদিনই মরনশীল। বস্তুও ধ্বংসশীল। মানুষ এসব জানতো, কিন্তু এই অবসান, এই ধ্বংস, এই অবলুপ্তি, অথবা এই নাস্তি মানুষের কাছে এতটা মূর্ত ছিলনা, যতটা মূর্ত হয়েছে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে। মানুষ যেন নতুন করে এবং গভীরতর ভাবে ভাবতে বসেছে যে নাস্তি বলে একটা কিছু আছে। মৃত্যু বা ধ্বংসই কেবল নাস্তি নয়, পরিবর্তনশীলতাও নাস্তিকে নির্দেশিত করছে। জগতের সব কিছুই অস্তি থেকে নাস্তিতে অবিরাম রূপান্তরিত হচ্ছে। এখানে বৌদ্ধধর্মের ক্ষণিকবাদের সঙ্গে টিলিক-এর দর্শনের তুলনা করা যেতে পারে। তবে নাস্তি অস্তিরই (being) একটি অংশ। ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে বা অবিরাম পরিবর্তনশীল এবং নিশ্চিতভাবে মৃত্যুপথযাত্রী—এরূপ চিন্তা ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একপ্রকার উদ্বেগের সৃষ্টি করে। উদ্বেগ ও ভয় (fear) এক বিষয় নয়। ভয়ের একটি বস্তুগত উৎস থাকে, যেমন বাঘের ভয়ের উৎস হলো বাঘ। ভয়ের উৎসকে আয়ত্তে আনতে পারলে সম্পর্কযুক্ত ভয়ও কেটে যায়। কিন্তু উদ্বেগের বস্তুগত কোন উৎস থাকে না। ব্যক্তির উদ্বেগ আছে, কিন্তু কোন বিষয়ের উদ্বেগ অথবা কোন বস্তু এই উদ্বেগের কারন, তা সে জানে না। কাজেই উদ্বেগের অতিক্রমন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

টিলিক উদ্বেগকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, ভাগ্য ও মৃত্যু সম্পর্কীয় উদ্বেগ। মৃত্যু হলো নাস্তি। এই নাস্তি প্রতিনিয়ত অস্তিকে মুলোৎপাটনের ভয় দেখাচ্ছে। মানুষের অস্তিত্বমুলক বা পরমতাত্ত্বিক সত্তা (ontic being) আছে, কিন্তু নাস্তি এই অস্তিত্ব বা পরমতাত্ত্বিক সত্তাকে উপড়ে ফেলে দিতে চায় সর্বদা। এ-থেকেই জন্মায় উদ্বেগ। টিলিক বলেন, এই উদ্বেগ থেকে মানুষের নিস্তার নেই। মৃত্যু-চিন্তা মানুষের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আসে না, মৃত্যু-চিন্তা সব সময়ই তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বর্তমান। কারন এক অর্থে মানুষ প্রতি মুহূর্তে মরছে, পরিবর্তনশীলতার ভেতর দিয়ে। টিলিক-এর প্রশ্ন : এমন উদ্বেগের মধ্যে মানুষ কি অস্তিত্বশীল থাকার সাহস দেখাতে পারে? মানুষ যদি প্রতিক্ষণেই মরছে, তাহলে সে অস্তিত্বশীল হলো কেমন করে? যা হোক, টিলিক-এর দ্বিতীয় প্রকারের উদ্বেগ হলো, শূণ্যতা-সম্পর্কীয় উদ্বেগ এবং অর্থহীনতা-সম্পর্কীয় উদ্বেগ (anxiety about nothingness and meaninglessness)। মানুষ সৃষ্টিধর্মী, জগতে সে তার সৃষ্টিকে রেখে যেতে চায় তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য হিসেবে। কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এরূপ ভাবনা থেকে মানুষের শূণ্যতার উপলব্ধি আসে, এবং তা থেকেও জন্মায় আর একপ্রকার উদ্বেগ। আবার, মানুষ পূর্ণ (being) থেকে বা পরমসত্তা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীতে বিচরন করছে, অথবা অধ্যাত্মিক পরমসত্তা থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে,—এরূপ ভাবনা থেকেও মানুষের জীবনের অর্থহীনতার বোধ জন্মায়। তার মনে হয় জীবন ও জগৎ অর্থহীন। আর এ-থেকেও আসে তার উদ্বেগ। কখনো কখনো এরূপ উদ্বেগ থেকে রেহাই পাবার জন্য মানুষ নিজেকে পরাধীন মনে করে এবং স্বাধীন চিন্তা ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ সে যেন নিজেকে

এক অদৃশ্য শক্তির কাছে সঁপে দেয়। টিলিক-এর তৃতীয় প্রকারের উদ্বেগ হলো, অপরাধবোধাত্মক এবং ঘৃণাবোধাত্মক উদ্বেগ। মানুষ সীমিত হলেও অন্ততঃ কিছুটা স্বাধীনতা তার রয়েছে। এই সীমিত স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে সে নিজেকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি কি তার স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সত্যি সত্যি নিজেকে যথার্থভাবে গড়ে তুলতে পারছে? স্বীয় ইচ্ছানুয়ারী নিজেকে গড়ে তোলা তার দায়িত্ব, কর্তব্য। সে কি তার কর্তব্য পালন করছে? কিন্তু তার দায়িত্ব মানুষ পালন করছে কি করছে না মানুষ তা কেমন করে বুঝতে পারবে? তার কাছে তো কোন মাপ-কাঠি নেই? কোন নির্ধারিত আদর্শ নেই? তাহলে সে কি তার কর্তব্য পালন করছে, অথবা করছে না? এরূপ ভাবনা থেকে উপজাত হয় তার অপরাধ বোধাত্মক (guilt) এবং ঘৃণাবোধাত্মক (condemnation) উদ্বেগ। সে হয়তো তার কর্তব্য পালন করছে না, তাই তার অপরাধবোধ, এবং এ-থেকে নিজের প্রতি ঘৃণা। আর এ দুটো থেকে আসে তার নৈরাশ্য (despair)। টিলিক বলেন, এই তিন প্রকার উদ্বেগ এবং নৈরাশ্য প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে স্বাভাবিকভাবেই আসে। তিনি প্রশ্ন তোলেন : এরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মতো সাহস কি মানুষের আছে? এই হলো *The Courage to Be* নামক পুস্তকে টিলিক-এর মূল প্রশ্ন। টিলিক বলেছেন, মানুষেব গোটা জীবনটাই এই নৈরাশ্যকে দূর করার এক অবিরাম প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই নৈরাশ্য থেকে নিস্তার নেই, রেহাই নেই কোন ব্যক্তি-মানুষের। ইতিহাসের ধারাবাহিকতাতেও টিলিক এই নৈরাশ্যের চিত্র দেখতে পেয়েছেন। প্রাচীন গ্রীসের ক্ল্যাসিক্যাল যুগে মৃত্যু ও ভাগ্য-জনিত নৈরাশ্যের মুখোমুখি হয়ে মানুষ স্টয়িকদের (Stoics) সাহস গ্রহণ করেছিলো। মধ্যযুগে অপরাধবোধাত্মক ও ঘৃণাবোধাত্মক উদ্বেগ-জনিত নৈরাশ্য ধর্মগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করলো, এবং বিংশ শতাব্দির শূণ্যতা ও অর্থহীনতার বোধ-জাত নৈরাশ্য সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হলো। টিলিক বলেন যে আধ্যাত্মিকতার অভাবই এ-সবকিছুর মূল কারন। আর তাই কৃষ্ণ-কালো নৈরাশ্যকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলে দিতে প্রয়োজন হলো ধর্মনিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা।

সার্ত্র ও অস্তিত্ববাদ

অস্তিত্ববাদ যুক্তি বা বুদ্ধির সার্বভৌম ক্ষমতাকে সন্দেহ করে দর্শনে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেছে। বুদ্ধি (Rationality) সার্বিক বচন তৈরী করতে পারে, কিন্তু ব্যষ্টি মানুষের বিশেষ পরিস্থিতির (Particular situation) ব্যাখ্যা দিতে পারে না, অথবা বিশেষ সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। কাজেই অস্তিত্ববাদের জন্ম বুদ্ধিবাদের উর্বর ক্ষেত্র জার্মানীতে হলেও সেখানে তার বিস্তার যর্থাথভাবে হয়নি, হয়েছে ফ্রান্সে যেখানে বুদ্ধিবাদের চেয়ে আবেগ ও অনুভূতির প্রভাব খানিকটা বেশী। অস্তিত্ববাদ বলেছে যে মানুষের আবেগ, ইচ্ছা, নৈরাশ্য, উদ্বেগ ইত্যাদিকে দার্শনিক চিন্তার বহির্ভূত রাখা চলবে না। কারণ অস্তিত্ববাদ অনুসারে দর্শনের কেন্দ্রে থাকবে মানুষ যার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে আবেগ, ইচ্ছা নৈরাশ্য, উদ্বেগ ইত্যাদি। অস্তিত্ববাদ মনে করে যে দর্শনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান, মুক্তি এবং স্বাধীনতা। এসব মানবীয় উপাদানগুলোর বিচার করতে হবে দর্শনে। এই উপাদানগুলো ব্যষ্টি ব্যক্তির, সমষ্টি মানুষের নয়। তাই দর্শনে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জোয়ার এলো, যখন অস্তিত্ববাদ তার মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়লো। জার্মানীর তুলনায় ফ্রান্সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব অধিক। বোধকরি এ কারণেই জার্মানীতে ভূমিষ্ঠ অস্তিত্ববাদের শিশু ফ্রান্সে বড় হবার সুযোগ পেলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অস্তিত্ববাদের ঢেউ জার্মানী থেকে ফ্রান্সে এসে লাগলো। এরপর সারা বিশ্বে যে অস্তিত্ববাদ ছড়িয়ে পড়লো তার মূলে রয়েছেন ফ্রান্সের কিছু অস্তিত্ববাদী চিন্তা-নায়কগন। বিশেষকরে আমেরিকার অস্তিত্ববাদের শিখা ফ্রান্স থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো আর ফ্রান্স তথা বিশ্বের অন্যত্র অস্তিত্ববাদের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে সব মনীষী তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জাঁ-পল্ সার্ত্র (Jean-Paul Sartre)।

প্যারিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সার্ত্র-এর (১৯০৫-১৯৫৬) জন্ম হয়। ইকোল নর্মাল সুপেরিয়র-এ পাঠ শেষ করে বৃত্তি পেয়ে তিনি জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এর পর ফ্রাইবুর্গ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দু'বছর গবেষণা করেন। ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক বা রেক্টর অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগার-এর অধীনে এসময়েই তিনি গবেষণা করেছিলেন। ফ্রান্সের সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। সার্ত্র গোটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হুসের্লএর কাছে দর্শনশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করার সময় হুর্সেল এর দ্বারাও প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী নূন্যতম প্রতিরোধ অতিক্রম করে অস্ট্রিয়া,

চেকোশ্লাভাকিয়া এবং পোল্যান্ড দখল করে নেয়। এতে ফ্রান্সসহ অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলো হিটলারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। ফ্রান্সের সরকার সার্ত্রকে সৈন্যবাহিনীতে জরুরী-কালীন বাধ্যতামূলক কর্মে নিয়োগ করেন। তাঁর বন্ধু এবং বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক এবং রাজনীতি-বিশ্লেষক রেমণ্ড এরণ-এর (Raymond Aron) উপদেশানুসারে তিনি সৈন্য বাহিনীর আবহাওয়া দফতরে কাজ করতে থাকেন। এখানে তিনি লেখাপড়া ও রচনার জন্য অনেক সময় পান। ১৯৪০-এ জার্মানীর কাছে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করলে সার্ত্র-কে যুদ্ধ-বন্দী করা হয়। ঐ বছর জুন মাস থেকে ১৯৪১-এর মার্চ মাস অবধি তিনি যুদ্ধ-বন্দী ছিলেন। এই সময়ই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Being and Nothingness* - এর পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। যুদ্ধ-বন্দী অবস্থায় জার্মানীর আক্রমনের প্রতিবাদে এক ব্যাঙ্গাত্মক নাটক রচনা করেন, এবং বড়দিনের অবসরে নাটকটি মঞ্চস্থ হলে তাতে অভিনয়ও করেন। অনতিকাল পর তিনি স্বাস্থ্যের কারনে যুদ্ধ-বন্দী-দশা থেকে অব্যাহতি পান এবং জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত নিজ দেশ ফ্রান্সে দর্শনের পাঠ-দান করতে থাকেন। রাজনৈতিক মানসিকতা তাঁর না থাকলেও দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে রাজনীতির মুখে ঠেলে দেয়। তিনি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ একটি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন এবং 'ফরাসী লেখকদের প্রতিরোধ আন্দোলন' (French Writer's Resistance Movement) নামক এক সংস্থার সদস্য হন। জার্মানীর আক্রমণের নিন্দা করে তিনি সে সময়ে দুটি নাটক লেখেন (১৯৪৩-৪৪) এবং দুটি নাটকেরই পরিচালনা তিনি নিজে করেন। এই নাটক দুটি হলো ঃ *The Flies* (১৯৪৩) এবং *No Exit* (১৯৪৪)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিদেশী শক্তির করতলগত ফ্রান্সের নৈরাশ্য-জনক পরিবেশেই সার্ত্র তাঁর প্রধান এবং বিখ্যাত গ্রন্থ *Being and Nothingness* রচনা করেন। ১৯৪২-এর বিবর্ণ শীতকালে সার্ত্র এই রচনা শুরু করেন।

সার্ত্র-এর এবং তাঁর চল্লিশবছরের জীবন-সঙ্গিনী (এঁদের মধ্যে বিয়ে হয়নি) ঔপন্যাসিকা সিমোঁ দ বুভার-এর অধিকাংশ লেখাই রচিত হয়েছে প্যারিসের কয়েকটি কাফেতে। কাফের উজ্জ্বল আলো, লোক-জনের আনাগোনা, আহারের শব্দ, সিগারেটের ধোঁয়া—এমনি এক পরিবেশে সার্ত্র-এর *Being and Nothingness* রচিত! অনেকে সার্ত্র-কে কাফের দার্শনিক বলে উপেক্ষাও করতে চেয়েছেন। কিন্তু দার্শনিক ও সাহিত্যিক রচনার জন্য এরূপ একটি স্থান বেছে নেবার পেছনে কয়েকটি যুক্তি থাকতে পারে। প্রথমত, তৎকালীন ইউরোপের বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পীগণ সাধারণতঃ কাফেতে মিলিত হতেন। দ্বিতীয়ত, কাফেগুলো স্বাভাবিক কারনেই অন্যান্য স্থানের তুলনায় উষ্ণ থাকতো। শীত প্রধান দেশ ফ্রান্সে তাই

কাফেগুলো দার্শনিক চিন্তার পক্ষে অনুকূল ছিল। তৃতীয়ত, সার্ত্র মানুষের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয়, অর্থাৎ এক কথায় জীবনমূলক প্রকৃত পরিস্থিতিকে তাঁর দর্শণে বিশ্লেষণ করতে চেয়ে ছিলেন। কাফেগুলোতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের ভিড় হতো। মানুষের পরিস্থিতিকে স্বচক্ষে দেখার একটি বড় সুযোগ ছিল এই কাফেগুলোতে।

সার্ত্র একসময়ে বাম-পন্থী রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। আমেরিকার লেখক সি. রাইট মিলস (C.Wright Mills), দার্শনিক হার্বর্ট মারকিউস (Herbert Marcuse), এবং মনোবিজ্ঞানী আর. ডি. লেইং-এর (R.D. Laing) সঙ্গে নব্য-বামপন্থী (New Left) হয়ে তিনিও একসময়ে বলতেন যে হিংসার উত্তর হিংসাই (Violence for Violence) হওয়া উচিৎ। তিনি বলতেন যে বিপ্লবের ফলে সমাজের বিশুদ্ধকরণ হবে। সার্ত্র একাধারে ছিলেন দার্শনিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং সমালোচক। জার্মানদেরকে ব্যঙ্গ করে তিনি আরও দুখানি নাটক রচনা করেন। ১৯৪১ এ জার্মানীতে যুদ্ধ বন্দীদশা থেকে সার্ত্র মুক্ত হলেন এবং দেশে ফিরে এসে *Men Without Shadows* (১৯৪৬) নামক নাটক রচনা করেন। তাঁর অপর নাটকখানি হলো *Iron in the Soul*। এটিতেও তিনি জার্মানিদের প্রতি তাঁর প্রচন্ড ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে শান্তি ফিরে এলো এবং সার্ত্র শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ সময় লেখার কাজে ব্যয় করতে লাগলেন। ১৯৪৫-এ সার্ত্র *Les Temps Modernes* নামক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করলেন এবং নিজেকে সমসাময়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে ফেললেন। মার্কস-এর অর্থনৈতিক ও বিপ্লবী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি *Critique of Dialactical Reason* (১৯৬০) রচনা করেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি মার্কসবাদ থেকে দূরে সরে আসেন এবং নিজেকে কেবলমাত্র অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে বিবেচনা করেন। ১৯৬৪ - এ সার্ত্র কে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার গ্রহন করতে আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে ঐ পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাঁর *Being and Nothingness* — এর ওপর এই নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিলো। সার্ত্র-এর অন্যান্য দার্শনিক এবং সাহিত্যিক রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ *The Flies* (১৯৪৬), *The Exit* (১৯৪৬), *The Transcendence of the Ego* (১৯৩৬), *Nausea* (১৯৩৮), *Roads to Freedom* (১৯৪৫-১৯৪৯), চার খন্ডে প্রকাশ করার কথাছিল, তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে), *Sketch of a theory of Emotions* (১৯৩৯), *Phychology of Imagination* (১৯৪০), *Existentialism and Humanism* (১৯৪৬) এবং *Critique of Dialectical Reason* (১৯৬০)।

১৯৩৮ -এ সার্ত্র এর প্রথম উপন্যাস *Nausea* প্রকাশিত হলো। তাঁর অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তার বীজ এখানে রয়েছে। উপন্যাসের নায়ক রকুয়েন্‌টিন (*Requentin*) এক অনতিক্রম্য দ্বন্দ্বের মুখোমুখী—তার চেতনা স্বচ্ছ, তাতে সে কোন সারসত্তা দেখতে পাচ্ছে না; আর তার সামনে যে বাদাম গাছটি (*Chestnut Tree*) রয়েছে তার সারসত্তা আছে। বাদাম গাছটি পূর্ণ, গঠিত, তৈরী; তার সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে, অথবা তার বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। বাদাম গাছটি এমন কিছু যার পরিবর্তন নেই—এটি বড় হতে পারে, এতে ফল ধরতে পারে, তবু এটি বাদাম গাছই থেকে যাবে। কিন্তু রকুয়েন্‌টিন-এর তো কোন সংজ্ঞা হতে পারে না, কারণ সে অপূর্ণ। তার বর্ণনাও হতে পারে না। কারণ সে এ-ও নয় আবার সে-ও নয়। এক এক মুহূর্তে এক একটি রকুয়েন্টিন রয়েছে। কাজেই তার সারসত্তা নেই। সে শুধু আছে অর্থাৎ তার কেবল অস্তিত্ব আছে। কেউ যদি তাকে প্রশ্ন করেঃ সে কে? তা হলে তার কোন উত্তর থাকবে না। কিন্তু কেউ যদি ঐ গাছটি সর্ম্পকে একই প্রশ্ন করে, তাহলে আমরা বলতে পারি ঃ এটি একটি বাদাম গাছ। কাজেই বাদাম গাছের সারসত্তা এবং অস্তিত্ব (existence) উভয়ই আছে, আর রকুয়েন্টিন এর কেবল আছে অস্তিত্ব। গাছটি পূর্ণ, কিন্তু রকুয়েন্টিন শূণ্য। সে আছে, অথচ তার সারসত্তা নেই। রকুয়েন্টিন-এর এই অভ্যন্তরীত দ্বন্দ মূলক চিন্তাধারা পরবর্তীকালে তার সামনে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সর্ম্পক তুলে ধরেছে। ব্যক্তি শূণ্য, অর্থহীন অস্তিত্ব মাত্র, অথচ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত সমাজ শূণ্য নয়। স্বেচ্ছাচারী সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতা অত্যন্ত দূর্বল। তাই ব্যক্তি নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। তাঁর পরবর্তীরচনা ত্রয়ী নাটক (*The Roads to Freedom*) -এ সার্ত্র এই ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব তুলে ধরেন। এই ত্রয়ী নাটকের নায়ক ম্যাথিউ (Mathieu) প্রথমে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, কিন্তু পরিবেশের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রনের ফলে শনৈঃ শনৈঃ গোষ্ঠীচেতনা ভ্রাতৃবোধ এবং মার্কসবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। বুর্জোয়া চিন্তাবিদ ম্যাথিউ তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলতে পারেননি অথচ সমাজে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মিথ্যে কথা, অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। এর ফলে ম্যাথিউ-এর অন্তরে বিপরীত মুখী দুটো নোদনার (drive) দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ম্যাথিউ। সার্ত্র তাঁব দর্শনে যে মানবিক পরিস্থিতির (human situation) কথা বলেছেন, ম্যাথিউ-এর পরিস্থিতি তার একটি নমুনা। সার্ত্র-এর নাটকগুলো উচ্চস্তরে বুদ্ধিমত্তা এবং দার্শনিক চিন্তাধারায় মন্ডিত। কাজেই তাঁর সাহিত্যিক রচনা শুধু সাহিত্য নয়, দর্শনও বটে। তাঁর নাটকগুলোর গভীরতম তলদেশে রয়েছে এক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তা—কেমন করে ভ্রান্তবিশ্বাসের মধ্যে (bad faith) নিজেকে হারিয়ে না ফেলে সামাজিক কাঠামোর মধ্যেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যায়।

সার্ত্র-এর কম-বেশী আট শ' পৃষ্ঠার বই *Being and Nothingness* হেগেল-এর *Phenomenology of Spirit*-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। হেগেল-এর বই-এ অবভাসের আলোচনা করা হয়েছে। সার্ত্র তাঁর বই-এ অবভাসের আলোচনা থেকে শুরু করলেও তিনি হেগেল-এর যুক্তিবাদ (rationalism) এবং সারসত্তাবাদের (essentialism) কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবে সার্ত্র মূলতঃ হুসের্ল-এর অবভাস থেকেই তাঁর দার্শনিক চিন্তা শুরু করেছেন। হেগেল-এর এবং হুসের্ল-এর অবভাসকেতিনি স্বীকার করেননি। তবে হুসের্ল-এর মতোই সার্ত্র দেকার্ত - এর অহম্ কে (ego) দর্শনের যাত্রাস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, যে কোন দার্শনিক আলোচনার প্রথমেই অহম্-এর বা স্বীয় চেতনার বিশ্লেষনের প্রয়োজন আছে। তবে হুসের্ল-এর মতোই তিনিও দেকার্ত-এর অহম্-কে মেনে নিতে পারেননি । সার্ত্র বলেন, অহম্ কোন চিন্তাশীল সত্তা নয়, কেননা চেতনার সারসত্তা নেই; অথবা চেতনা চিন্তার কর্তা (subject) নয়। অর্থাৎ চেতনা কোন বস্তু বা বিষয় নয় যা চিন্তা করে। চেতনার কেবল অস্তিত্ব আছে। চেতনা ক্রিয়া করছে বটে, কিন্তু কর্তা হিসেবে নয়, কারন কর্তা বলতে আমরা গঠিত, তৈরী (finished) কোন সত্তাকে বুঝিয়ে থাকি। চেতনার গঠিত বা মূর্ত সত্তা নেই, প্রতি মুহূর্তে এর পরিবর্তন হচ্ছে। কাজেই চেতনা শূণ্য। চেতনার একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে চেতনা কোন বস্তু অথবা বিষয়ের প্রতি প্রতিনিয়ত ধাবিত হচ্ছে (intentionality)। সার্ত্রএর (Nausea) তে রকুয়েন্টিন এজন্যই বলেছে যে তার ভেতরে "কোন ব্যক্তিই বাস করে না।" সার্ত্র বলেছেন যে একদিকে যেমন রয়েছে ব্যক্তির চেতনা, অন্য দিকে তেমনি রয়েছে বিশ্বজগৎ। চেতনা বিশ্বজগৎকে মুখোমুখি বা সরাসরি দেখছে। বিশ্বজগৎ-কে দেখেই চেতনা অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। আমরা যদি কোন কিছু সর্ম্পকেই চেতন না থাকি, তাহলে আমাদের কোনরূপ চেতনাই থাকতে পারে না। বিষয়ের চেতনা-বিহীন প্রত্যক্ষ যেমন মিথ্যে, তেমনি বিষয়হীন চেতনাও মিথ্যে। হুসের্ল-এর এই বক্তব্য সার্ত্র আরও জোরালো ভাবে তাঁর *Being and Nothingness*-এ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, চেতনা হলো শূণ্য এবং স্বচ্ছ, একটি বাদাম গাছ বা অন্য কোন বস্তুর মতো পূর্ণ এবং অস্বচ্ছ নয়। সার্ত্র দেকার্ত-এর অহম্ এর ধারণা মেনে না নিলেও তার অপর একটি বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। দেকার্ত বলেছিলেন যে চেতনা মানেই স্বীয় চেতনা। অর্থাৎ আমরা যখনই কোন বিষয় সর্ম্পকে চেতন থাকি, তখনই বুঝতে হবে যে আমরা শুধু ঐ বিষয় সম্বন্ধেই চেতন নই, আমরা যে ঐ বিষয় সর্ম্পকে চেতন—এ চেতনাও আমাদের আছে। সার্ত্র ফ্রয়েড-এর (Freud) নির্জ্ঞান-স্তরের (Unconscious) ধারনাকেও অস্বীকার করেছেন। ফ্রয়েড মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছিলেন—চেতনস্তর, অবচেতনস্তর এবং নির্জ্ঞান-স্তর। তিনি বলেছিলেন যে নির্জ্ঞান-স্তরের বিষয়গুলো সর্ম্পকে আমরা

চেতন থাকি না। কিন্তু সার্ত্র বলেন যে চেতনা কখনোই বিষয় ভিন্ন হতে পারে না। কাজেই নির্জ্ঞান-স্তর বলে কিছু নেই।

সার্ত্র দু'রকম বিষয়ের (being) কথা বলেছেন---চেতনা এবং চেতনার বিষয়। এর প্রত্যেকটিকে সার্ত্র এক একটি বিষয়ের আঞ্চলিকতা (region of being) অথবা আঞ্চলিক (regional being) বিষয় বলেছেন। আবার, বস্তুকে সার্ত্র 'বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়' (being-in-itself অথবা *en soi*) বলেছেন, আর চেতনাকে বলেছেন 'বিষয়ের জন্য বিষয়' (being-for-itself অথবা pour soi)। বিষয়ে অধিষ্ঠিত-বিষয় কারণ-কার্য-শৃঙ্খলায় বা কারণতায় (causality) আবদ্ধ। কারণতার জনাই বিষয়ে—অধিষ্ঠিত-বিষয় মূর্ত্ত এবং অপরিবতর্নশীল। কারণতার জন্য বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় মূর্ত, কেননা কারণ একে বিশেষ এক রূপ দিয়েছে। আর ঐ কারণের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় তাই পরিবর্তিত হতে পারে না। সার্ত্র বলেন যে, এই বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় ভীষণভাবে বা নিশ্চিতভাবে ('massively') অস্তিত্বশীল। পক্ষান্তরে, বিষয়ের জন্য বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলো হলো চেতন বিষয ('conscious being') অথবা সংক্ষেপে চেতনা। বিষয়ের জন্য বিষয় একাধারে বস্তু বা বিষয়ে অধিষ্ঠিত-বিষয় সম্পর্কে চেতন, এবং বস্তু বা বিষয়ে অধিষ্ঠিত-বিষয় সম্পর্কে তার যে চেতনা আছে, এ-সম্পর্কেও চেতন। সহজ করে বলা যেতে পারে যে বিষয়ে অধিষ্ঠিত-বিষয় হলো অচেতন বস্তু, আর বিষয়ের-জন্য-বিষয় হলো সচেতন বস্তু (মানুষ)। এখানে মনে রাখতে হবে যে বিষয়ের-জন্য-বিষয় বিশুদ্ধ চেতনা (pure consciousness) নয়, কেননা এ-চেতনা সর্বদাই কোননা কোন বস্তুর প্রতি ধাবিত হচ্ছে, এবং তাই চেতনা সব সময়ই কোন না কোন বস্তুর চেতনা। চেতনা যেন এক স্বচ্ছ বিষয় (transparent) যার মাধ্যমে বিষয়ের জন্য-বিষয় (মানুষ), বিষয়ে অধিষ্ঠিত বিষয়কে (বস্তুকে) প্রত্যক্ষণ করে।

সার্ত্র তাঁর *Being and Nothingness* এ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যথার্থ মানুষ (authentic man) হতে হলে বিষয়ের জন্য বিষয় হতে হবে। আবার বিষয়ের-জন্য-বিষয় হতে হলে মানুষকে এ-ও বুঝতে হবে যে সে এক বিরাট, অনতিক্রম্য কারণতা বা কার্য কারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। তাকে বুঝতে হবে যে সে পূর্ব থেকে নির্ধারিত এক বিরাট বিষয়ে অধিষ্ঠিত বিষয়ের (জগৎ) দ্বারা আবৃত রয়েছে। মানুষকে বুঝতে হবে যে বিষয়ের-জন্য-বিষয় এবং বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ের মধ্যে এক অনতিক্রম্য দূরত্ব অথবা শূণ্যতা রয়েছে। বিষয়ে অধিষ্ঠিত বিষয় নির্ধারিত (determined); এ যা, এ কেবলমাত্র তা-ই; এর অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা (possibility) নেই, যদি বাইরে থেকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে একে অন্য কিছুতে পরিণত করা না হয়। তবে সেক্ষেত্রেও বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় কারণতা বা কারণ কার্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে। 'এর অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা আছে'—

একেই সার্ত্র অন্যভাবে বলেছেন যে'এর মধ্যে অভাব (lack) আছে।' অভাব না থাকলে সম্ভাবনা থাকতে পারে না। যেমন, বিষয়ের-জন্য- বিষয় অবশ্যই বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় হতে পারে, অর্থাৎ এরূপ সম্ভাবনা আছে। কাজেই বিষয়ের-জন্য-বিষয়ে একপ্রকার অভাব আছে। কিন্তু এরূপ অভাব বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ে নেই। বিষয়ে অধিষ্ঠিত -বিষয় যা, সে তা-ই। যেমন, একটি কলম একটি কলমই। কারন-কার্য-শৃঙ্খলায় এটি বাধাঁ। এটি কেন কলমরূপে রয়েছে তার কারন আছে এবং যে পর্য্যন্ত এই কারনে কোন পরিবর্তন হবে না, সে পর্য্যন্ত কলমটি কলমই থেকে যাবে। সুতরাং কলমটি নির্ধারিত (determined) এবং গঠিত (finished), আর তাই এর ভেতর কোন অভাব (lack) নেই। পক্ষান্তরে, বিষয়ের-জন্য-বিষয় কারন-কার্য-শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই তার অপর কোন কিছু হবার সম্ভাবনা আছে এবং তাই বিষয়ের-জন্য-বিষয়ে অভাব আছে।

সার্ত্র বলেন যে বিষয়ের-জন্য-বিষয়কে সংক্ষেপে চেতনা বলা যায়। তিনি বলেন যে 'চেতনা আছে' এ-কথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি, কিন্তু চেতনা কী—তা আমরা বলতে পারি না। 'চেতনা কী?'—এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা কেবলমাত্র বলতে পারি যে চেতনা হলো বিশেষ একপ্রকারের ক্রিয়া। কিন্তু এরূপ উত্তর থেকে আমরা চেতনার স্বরূপ বুঝতে পারি না। যা হোক, সার্ত্র বলেছেন যে যেহেতু চেতনা নির্ধারিত নয় বা গঠিত (finished) নয়, সেহেতু চেতনায় সারসত্তা নেই। আবার বলা যায় যে যেহেতু চেতনায় অভাব রয়েছে অথবা সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু চেতনায় সারসত্তা নেই। চেতনায় সারসত্তার অভাব আছে, একথা বলে সার্ত্র মানুষের মধ্যে একটি নঞর্থক দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সার্ত্র-এর এরূপ ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়ের-জন্য-বিষয়ে (অর্থাৎ মানুষের মধ্যে) অভাব (lack) আছে বলেই মানুষের মধ্যে এক প্রকার অস্বস্তিবোধ (dis-satisfaction) রয়েছে। এই অস্বস্তিবোধ দূর করতে মানুষ প্রতি মুহূর্তে কিছু হতে চাইছে, তার অভাব দূর করতে চাইছে, তার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে চাইছে। মানুষের ভেতরকার অভাবকে (lack) সার্ত্র নাস্তি (Nothingness) বলেছেন। তিনি বলেন যে এই নাস্তি, চেতনার ভেতর দিয়ে পৃথিবীতে (মানুষের মধ্যে) এসেছে। মানুষের মধ্যে চেতনা আছে বলেই সে তার অভাবকে, তার নাস্তিকে, বুঝতে পারে। মানুষের মধ্যে নাস্তি আছে বলেই মানুষ প্রশ্ন করতে পারে ঃ 'আমি এরূপ হতে পারি' অথবা 'আমার এরূপ হবার সম্ভাবনা আছে'। মানুষের মধ্যে নাস্তি আছে বলেই মানুষ প্রশ্ন করতে পারে ঃ বস্তু কী? বস্তু কেন আছে? চেতনা কী? কেন চেতনা আছে? ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, বিষয়ে-অধিষ্ঠিত বিষয় এরূপ প্রশ্ন তুলতে পারে না। তাই সার্ত্র বলেন যে প্রশ্নকর্তা হিসেবে মানুষের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।

বিষয়ের-জন্য-বিষয়ের একদিকে যেমন অভাব আছে, নাস্তি আছে, অপর দিকে তেমনি স্বাধীনতা (freedom) আছে। নাস্তি আছে বলেই স্বাধীনতা আছে, বিষয়ের-জন্য-বিষয় নির্ধারিত হলে তাতে স্বাধীনতা আছে , বিষয়ের-জন্য-বিষয় নির্ধারিত হলে তাতে স্বাধীনতা থাকতে পারতো না। আবার তার স্বাধীনতা আছে বলেই বিষয়ের-জন্য-বিষয় কোন কিছুকে অস্বীকার করতে পারে। প্রশ্ন তুলতে পারে, কল্পনা করতে পারে, এমনকি অস্তিত্বশীল বিষয়কে নাস্তিতে পরিণত করতে পারে। শেষের বিষয়টি সার্ত্র একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিয়েছেন। ধরা যাক সার্ত্র তাঁর বন্ধু পিয়েরে -কে (Pierre) খুঁজতে একটি কাফেতে ঢুকেছেন। কাফেতে অনেক মানুষের ভিড়, অনেক শব্দ, অনেক আসবাবপত্র ইত্যাদি রয়েছে। উৎসুক হয়ে সার্ত্র ঐ কাফেতে ঢুকলেন পিয়েরে-কে খুঁজে বের করতে; কিন্তু পিয়েরেকে না পাওয়াতে কাফেতে সব কিছু একমুহূর্তে অর্থহীন হয়ে পড়লো। এবং ফলে সবকিছু নাস্তিতে পরিণত হলো। সার্ত্র তাই বলেছেন যে, বিষয়ের-জন্য-বিষয়, বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়কে নাস্তিতে পরিণত করার স্বাধীনতার অধিকারী। সার্ত্র বলেন যে এই স্বাধীনতা মানুষের অস্তিত্বের মূল সত্য। বিষয়ে অধিষ্ঠিত-বিষয়ের এই স্বাধীনতা নেই। কারন সে কারন-কার্য-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় নির্ধারিত বলে পূর্বের অর্থাৎ অতীতের ক্রিয়া বা অবস্থাকে অস্বীকার করতে পারে না। একটি কলম যে যে উপাদানে গঠিত তা হলো কলমটির কারনের অংশ এবং এগুলোকে কলমটি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। বড় গাছটি এক সময় ছোট্ট একটি গাছ ছিল---বড় গাছটি একথা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু মানুষ তার অতীতকে অস্বীকার করতে পারে। কেউ অতীতে একরূপ ছিল, আর বর্তমানে অন্যরূপ। এখানে আমরা বলতে পারি না যেহেতু অতীতে সে তেমন ছিল কাজেই বর্তমানে সে এমন। কিন্তু গাছটির সর্ম্পকে আমরা নিশ্চয় বলতে পারি যে অতীতে এটি এমন ছিল বলেই বর্তমানে এটি এমন হয়েছে। কিন্তু বিষয়ের-জন্য-বিষয় বা মানুষ (চেতনা) সম্পর্কে আমরা এরূপ কারণতা বা কারণ -কার্য -শৃঙ্খলা অরোপ করতে পারি না। কারন মানুষ তার বর্তমানের অবস্থা তার অতীতের অবস্থা থেকে পায়নি---বর্তমানের অবস্থা তার নিজের চেয়ে নেয়া, পছন্দ করা (choice)। অর্থাৎ তার অতীত এবং তার বর্তমানের মধ্যে মানুষ দূরত্ব সৃষ্টি করার স্বাধীনতার অধিকারী। সে যেন ইচ্ছে করলেই বলতে পারে যে তার অতীত বলে কোন কিছু ছিল না।

তবে সার্ত্র বলেন যে মানুষের এই স্বাধীনতা তার কাছে আর্শীবাদ নয়। আমাদের সিদ্ধান্ত স্বাধীন বলেই তার দায়িত্বও আমাদের উপর বর্তায়। কিন্তু যেহেতু আমাদের এই বেছে নেওয়ার সপক্ষে কোনো বস্তুগত নৈতিক মানদন্ডের কোনো ভূমিকা নেই তাই আমরা বলতে পারি না আমাদের স্বাধীন নির্বাচন কতখানি যুক্তিযুক্ত। এর ফলে আমাদের দায়িত্বের বোঝা দুর্বহ হয়ে ওঠে এবং বিমর্ষতা (anguish)

উপজাতি হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে ঃ তাহলে কি মানুষ তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ের (বস্তুর) মতো জীবন যাপন করবে? সার্ত্র এ-প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন, কখনোই না। তাঁর *Being and Nothingness* এর প্রায় সম্পূর্ণ লেখাই মানুষের এই স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক শক্তিশালী এবং আবেগময় যুক্তি। সার্ত্র বলেন, এই স্বাধীনতাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র এবং আবশ্যিক (necessary) বৈশিষ্ট্য।

সার্ত্র, ফ্রয়েড এবং মার্ক্স-এর নিয়ন্ত্রণবাদ (theory of determination) অস্বীকার করেছেন। ফ্রয়েড বলেছিলেন যে চেতনা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, কারন নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious) চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার মার্ক্স-এর নিয়ন্ত্রণবাদকেও সার্ত্র মেনে নিতে পারেননি। মার্ক্স বলেছেন যে মানুষের চেতনা উৎপাদন - নীতির (mode of production) ওপর এবং শ্রেণী-সংগ্রামের (class-struggle) ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া, আধুনিক বিজ্ঞানও বলছে যে মানুষ জৈবিক , মনোবৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত। সার্ত্র এসব মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষের কিছু কিছু ঘটনা রয়েছে যেগুলো অবশ্যই নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত। এসব ঘটনা জৈবিক, মনোবৈজ্ঞানিক অথবা সমাজ-বৈজ্ঞানিক হতে পারে। যেমন তার জন্ম-তারিখ, তার যূথ-প্রবৃত্তি ইত্যাদি পরিবর্তিত করা যেতে পারে না। এমন সব ঘটনাকে একত্রে সার্ত্র ঘটনাময়তা বা ঘটনাত্ব (facticity) বলেছেন। কিন্তু সার্ত্র বলেন যে মানুষের চেতনা এসব ঘটনাময়তার উর্দ্ধে। চেতনায় রয়েছে স্বাধীনতা, চেতনা জৈবিক, মনোবৈজ্ঞানিক অথবা সমাজ-বৈজ্ঞানিক ঘটনাময়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ তার ইচ্ছানুসারে কোন কিছু পছন্দ করে, এবং সেইমত কাজ করে। আবার মানুষ তার চেতনার দ্বারা তার ঘটনাসমূহে অর্থারোপ করে থাকে, ঘটনাসমূহে তার সম্ভাবনা খুঁজে বের করে এবং সেই সম্ভাবনাতে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করে। মানুষ ঘটনাসমূহে তার সম্ভাবনা খুঁজে বের করে, কারণ মানুষ তার অভাবকে (lack) দূর করতে পারে এবং তার সম্ভাবনাতে বাস্তবায়িত করতে পারে একমাত্র ঘটনা সমূহের মধ্য দিয়ে। সে নতুন ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে অথবা বর্তমান ঘটনাতে পরিবর্তন আনতে পারে। মানুষ কল্পনার সাহায্যেও ঘটনাসমুহে পরিবর্তন আনতে পারে।

ঘটনা সমূহে মানুষ অর্থারোপ করে। ঘটনাসমুহে অর্থ আরোপিত হলে যা দাঁড়ায় তাকে সার্ত্র পরিস্থিতি (situation) বলেছেন। ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থযুক্ত সমগ্রই (জগৎ, সমাজ, ইত্যাদির সমষ্টি) হলো পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি মানুষ স্বাধীনভাবে রচনা করে। কোন ব্যক্তি বিষন্ন। এর কারন এই যে ঐ ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির দৃষ্টিকোন থেকে সমস্ত বস্তুই বা ঘটনাই বিষাদময়, এবং ঘটনাগুলোকে

বিষাদময় বলে বর্ণনা করেছে স্বাধীনভাবে ঐ বিশেষ ব্যক্তি নিজেই। ঠিক তেমনিভাবে প্রফুল্লচিত্ত মানুষ সবকিছুতেই আনন্দের হাতছানি দেখতে পায়। এছাড়া, ব্যক্তির বিশেষ আচরনও ব্যক্তি নিজেই বেছে নেয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কেউ সুরাপায়ী, কারন সে এমনি একটি পথ বেছে নিয়েছে স্বাধীনভাবে এবং সচেতনভাবে। সার্ত্র বলেন, অচেতনভাবে কেউ তার পরিস্থিতি রচনা করতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তির নিকট পরিস্থিতির যে অর্থ তা সে নিজেই রচনা করে।

ঘটনাসমূহে অর্থারোপ করার এই যে স্বাধীনতা, তার প্রয়োগ কিন্তু যথেষ্ট দায়িত্ব পূর্ণ এবং কঠিন ব্যাপার। প্রশ্ন হতে পারেঃ ব্যক্তি যে অর্থারোপ করবে তা সে কোথা থেকে পাবে? কী তার ভিত্তি হবে? কেমন করে সে অর্থ সৃষ্টি করবে? এ-প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পর্কে ভাবতে গেলে দেখা যাবে যে সর্বব্যাপী (absolute) সত্য বা সর্বব্যাপী অর্থ বলে কিছু নেই। এক এক ব্যক্তি এক এক ভাবে ঘটনা সমূহে অর্থারোপ করছে। মানুষ তাৎক্ষনিকভাবে, অর্থাৎ বিশেষ মুহূর্তে, ঘটনাসমূহে বা বিষয়ে পছন্দমতো অর্থারোপ করে, আর সে অর্থ শুধুমাত্র ঐ বিশেষ মানুষটির কাছেই তাৎক্ষনিক ভাবে সত্য। সার্ত্র আরও বলেন যে এই অর্থারোপের ওপরই মানুষের সারসত্তা নির্ভর করে। তবে এই সারসত্তা চিরস্থায়ী নয়, তাৎক্ষণিক। ব্যক্তি বস্তুতে বা বিষয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে যেমন যেমন অর্থারোপ করে, ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভবে তেমন তেমন বৈশিষ্ট্যের বা সারসত্তার অধিকারী। এই কারণেই অস্তিত্ববাদীগণ বলেন যে মানুষের প্রথমে থাকে কেবলমাত্র অস্তিত্ব এবং পরে আসে তার সারসত্তার প্রশ্ন। ব্যক্তির অর্থারোপ করার ক্রিয়া তার নিজের পরিবেশের (environment) বলয়ের মধ্যেই সীমিত থাকেনা, ব্যক্তি এমনকি গোটা বিশ্বে অর্থারোপ করে। কাজেই ব্যক্তির দায়িত্ব অপরিমেয়। অথচ ব্যক্তির পছন্দ বা নির্বাচনের (choice) জন্য সে নিজেই দায়ী। কোন কাজটি করা উচিৎ এবং কোনটি করা উচিৎ নয়, অথবা কোন্ আদর্শ অনুসরন করা উচিৎ এবং কোনটি করা উচিৎ নয়——এসব ব্যক্তিকে নিজেকেই করতে হবে। কেউ তাকে কোন রূপ সংকেত দেবে না। ব্যক্তি যে বিষয়টি নির্বাচিত করবে সেটি কেবল তার কাছে আদর্শস্থানীয় হবে না, হবে গোটা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে আদর্শস্থানীয়। কাজেই ব্যক্তির নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ অর্থের কোন উৎস ব্যক্তি জানে না। কেউ তাকে অর্থ বলে দিয়ে সাহায্যও করবে না, এমনকি ঈশ্বরও না, কারন সার্ত্র-এর মতে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এমন অবস্থায় ব্যক্তি এক প্রকার বিষন্নতায় (anguish) ডুবে যায়। মানুষ স্বাধীন, অথচ তার স্বাধীনতা তার কাছে ভয়ঙ্কর। তাই সার্ত্র বলেছেন যে মানুষকে যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে ("Man is condemned to be free.")।

তাই মানুষ সাধারণতঃ এই ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে চায়। আর এরজন্য অর্থাৎ স্বাধীনতাকে ত্যাগ করার জন্য সে তার চেতনায় অবস্থিত নাস্তিকে বিসর্জন দিয়ে শান্তি কামনার্থে বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ে (বস্তুতে) পরিণত হতে চায়। অর্থাৎ মানুষ যখন স্বাধীনভাবে ইচ্ছে মতো কর্তব্যকর্ম নির্বাচিত করতে পারে না, তখন সে প্রথাগত বিধি-নিষেধকে অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরে থাকে। একেই সার্ত্র বলেছেন মন্দ-বিশ্বাস (bad faith)। মানুষ তার স্বাধীনতা থেকে পালিয়ে, অর্থাৎ নির্বাচনের (choice) গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে মন্দ-বিশ্বাসের আশ্রয় নেয় এবং নিজেকে এভাবে বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ে (বস্তুতে) পরিণত করতে চায়। সার্ত্র এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক কুমারীকে কোন এক পুরুষ বিয়ে করতে চায়। একদিন পুরুষটি হঠাৎ কুমারীটির হার ধরেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কুমারীটি হতভম্ব হয়ে মুহূর্তে গভীরভাবে তার বিয়ের কথা, ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ইত্যাদি ভাবতে শুরু করে। এত গভীর ভাবে কুমারীটি ভাবনায় মগ্ন যে পুরুষটির হাতে যে তার হাতখানি রয়েছে, তা সে ভুলে থাকবার ভাণ করে, অর্থাৎ তার হাতখানি যেন তার ব্যক্তিত্ব থেকে (অথবা তার অহম্ থেকে) সর্ম্পূণ ভিন্ন, এমনিভাবে সে অভিনয় করতে থাকে। কুমারীটি ভাবে, এই মুহূর্তে যেন তার হাতখানি পৃথক এক জড় বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। নিজেকে এমনিভাবে বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ে (বস্তুতে) পরিণত করাকেই সার্ত্র মন্দ-বিশ্বাস বলেছেন। মন্দ-বিশ্বাসে ব্যক্তিভাবে যে তার প্রথাগত বা চিরাচরিত আচরন অথবা ভাবনার বাইরে যাবার কোন উপায় নেই—তার সে স্বাধীনতাই নেই। অথচ এ-বিশ্বাস তার ঠিক নয়, সে অবশ্য স্বাধীন, কারন চেতনা মানেই স্বাধীন চেতনা। যাহোক, সার্ত্র মন্দ-বিশ্বাসের আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কাফেতে চাকরগুলো (orderlies) ঠিক স্বাধীন মানুষ নয়, তারা চাকরের অভিনয় করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত আর নিজেদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যাবলীকে ভুলে বসে আছে। তারা যেন চাকর নামক এক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেরা যেন কেউ নয়, কিছুই নয়— তাদের একমাত্র পরিচয় এই যে তারা কতকগুলো চাকর। এরূপ ভাবনাই হলো মন্দ-বিশ্বাস। এমনিভাবে মন্দ-বিশ্বাসের শিকার হয়ে আমরা বলে থাকি 'আমি একজন শিক্ষক', অথবা 'আমি একজন ডাক্তার' অথবা 'আমি একজন ভিক্ষুক', ইত্যাদি। নিজের স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের কর্মপন্থা নির্ধারন করার গুরুদায়িত্ব দেখে ভয় পেয়ে দায়িত্ব-বিমুখ হয়েই কখনো কখনো আমরা এরূপ মন্দ-বিশ্বাসের আশ্রয় নিই। কিন্তু সার্ত্র এরূপ পশ্চাদপসনের নিন্দা করেছেন।

স্বাধীনভাবে কর্মপন্থা বা কর্তব্য বেছে নিতে গেলে বা নির্বাচন করতে গেলে অনেক রকম জটিলতা আসে নীতির ক্ষেত্রে। সার্ত্র নৈতিক আদর্শ বা কর্তব্য

নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা আসে তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক জার্মান যুবক এক নৈতিক দ্বন্দ্বের সন্মুখীন হয়। তার বাবা তার মায়ের সঙ্গেঁ ভীষণ ঝগড়া করতেন এবং নাৎসীদের সাহায্য করতে চাইছিলেন। তার বড় ভাই জার্মানদের হাতে মারা যায় এবং তাই যুবকটি প্রতিশোধ নেবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়ে জার্মানদের বিরোধিতা করতে চায়, অথচ মাকে বাবার কাছে ফ্রান্সে রেখে যাওয়াও নিরাপদ নয়। এমন অবস্থায় যুবকটি সার্ত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার কোন পথ বেছে নিতে উচিৎ। সার্ত্র তাকে কোন পথ-নির্দেশ না দিয়ে শুধু বলেছিলেন যে যুবকটির নিজেকেই স্বাধীনভাবে তার পথ বেছে নিতে হবে, নিজের পথ বেছে নেবার দায়িত্ব নিজের ওপরই বর্তাতে হবে। সার্ত্র যুবকটিকে বলেছিলেন যে কোন পরিস্থিতিতেই কেউ কাউকে সত্যিকারে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারে না। কারণ, প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ পরিস্থিতির অর্থ তার নিজের তৈরী করা। এ-অর্থ শুধু সে নিজে বুঝতে পারে, অপর কেউই নয়। তবে অস্তিত্ববাদের নির্দেশ অথবা উপদেশ এই যে, কেউ যেন মন্দ-বিশ্বাসে পতিত না হয়, অন্ধের মতো কাজ না করে। মন্দ-বিশ্বাসকে যে মানুষ গ্রহন করেছে সার্ত্র তাকে অযথার্থ (inauthentic) মানুষ বলেছেন। নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে অযাথার্থ্যকে গ্রহন করার অর্থ হলো নিজের কাছে থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখা, যাকে সার্ত্র বলেছেন বিচ্ছেদ অথবা আত্ম-বিচ্ছেদ (alienation)। এমন করে নিজেকে নিজের কাছে থেকে পৃথক করে রাখা, ঠিক হবে না। নিজেকে একাগ্র-চিত্ত (serious) হতে হবে এবং প্রথাগত বিধি-নিষেধকে অন্ধের মতো গ্রহন না করে নিজদায়িত্বে নিজের পথ বেছে নিতে হবে। যে এমন করতে পারবে সে-ই যথার্থ (authentic) মানুষ হবে। এই হলো সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের মানবিক (humanistic) দিক যা তাঁর *Existentialism is a Humanism*-এ (অথবা Existentialism and Humanism) বিধৃত হয়েছে। সার্ত্র তাঁর অস্তিত্ববাদকে মানবতাবাদও বলেছেন এজন্য যে তিনি মানুষকে নির্ধারিত (determined) বিষয় বলে মনে করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ তার স্বাধীন চেতনার সাহায্যে তার তাৎক্ষণিক বিষয়কে অতিক্রম করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে তার পরিবেশের অর্থ (meaning) সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ কোন যান্ত্রিক বিষয় নয় যা কারনতার দ্বারা বা কারন-কার্য-শৃঙ্খলার দ্বারা নির্ধারিত। সার্ত্র পূর্নভাবে বিশ্বাস করতেন যে মানুষ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা। তাঁর দর্শনের কেন্দ্র-বিন্দুতে মানুষ এবং মানুষের পরিস্থিতি রয়েছে বলেই সার্ত্র তাঁর অস্তিত্ববাদকে মানবতাবাদও বলেছেন।

যাহোক, প্রশ্নহলো : মানুষ তার পথ-নির্দেশ কোথা থেকে পাবে? অস্তিত্ববাদ এখানে নীরব। এতকাল ধর্ম বলেছে, ঈশ্বরই পথনির্দেশ দেবে। কিন্তু সার্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। কারন, তাঁর মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে স্বীয় স্বাধীনতাকে অস্বীকার

করতে হয়, এবং ফলে মন্দ-বিশ্বাস এসে যায়। পক্ষান্তরে, রাশিয়ার এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক যথার্থই বলেছিলেন যে যদি ঈশ্বর না থাকতো তবে যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন কাজ করতে পারতো। কেননা তখন ঈশ্বর-নির্ধারিত মূল্যবোধ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো না। আর তাই মানুষ যে কোন কাজ ইচ্ছে করলেই করতে পারতো। সার্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। কাজেই তাঁর মতে মানুষকে তার নিজের মূল্যবোধ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে, স্বাধীনভাবে। সমষ্টি-মানুষ ব্যষ্টি-মানুষের জন্য সার্বিক বা সর্বব্যাপী (absolute) মূল্য অথবা মানদণ্ড রচনা করবে না। প্রতিটি মানুষকে নিজের মূল্যবোধ এবং মানদণ্ড নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে। এই হলো মানুষের দায়িত্ব ভারাক্রান্ত পরিস্থিতি, যার জন্য সার্ত্রে বলেছেন যে মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এ-পর্যন্ত আমরা সাধারণভাবে এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে বিষয়ের জন্য-বিষয় এবং বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সে সম্বন্ধে সার্ত্রে-এর মতামত জানতে পারলাম। কিন্তু অখণ্ড-পূর্ণ (Encompassing) তো দুটো ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় (বস্তু) এবং অপরটি হচ্ছে অপরাপর-বিষয়ের জন্য-বিষয়সমূহ। এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন উঠতে পারেঃ বিষয়ের-জন্য-বিষয় (মানুষ) অপরাপর বিষয়ের-জন্য-বিষয়কে বুঝতে পারবে কেমন করে? নিজেকে ছেড়ে দিলে ব্যক্তি মানুষের কাছে তো বাকী সবকিছুই বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় হওয়া উচিৎ। কিন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ে চেতনা আছে (অথবা নেই) তা সে বুঝতে পারবে কেমন করে? মার্লু-পন্টি এখানে বলেছেন যে ব্যক্তি তার বুদ্ধি প্রয়োগের পূর্বেই বিজ্ঞান-পূর্ব (pre-scientific) প্রত্যক্ষের সাহায্যে বুঝতে পারে যে অপর ব্যক্তি-ও চেতনা-সম্পন্ন। অর্থাৎ ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখা মাত্রই এবং কোনরূপ অনুমান (inference) না করেই বুঝতে পারে যে অপর ব্যক্তিরও তার নিজের মতোই চেতনা রয়েছে। কিন্তু সার্ত্রে এখানে অন্য কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে অপর ব্যক্তির কাছে আমি একটি বিশেষ বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু নই, কেননা আমার দেহ অছে। অপর ব্যক্তি আমার চেতনাকে জানবার পূর্বেই আমার দেহকে দেখে। আমাব দেহটিকে দেখেই অপর ব্যক্তি আমার চেতনা-সম্পর্কে অনুমান করে থাকে। কাজেই অপর ব্যক্তির কাছে আমি প্রথমে এবং মূলতঃ বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়। কিন্তু আমার নিজের কাছে আমি শুধু মাত্র বিষয়ের-জন্য-বিষয়। ঠিক এমনিভাবে আমার কাছে অপর ব্যক্তি প্রথমতঃ দেহ এবং পরে চেতনা সম্পন্ন বিষয়। আমি যখন ভাবি যে আমার দেহে যেমন চেতনা আছে, অপর ব্যক্তির দেহেও তেমনি অবশ্যই চেতনা আছে, তখনই অপর ব্যক্তির দেহ আমার কাছে চেতনা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এমনিভাবে অপরাপর

বিষয়ের-জন্য-বিষয়গুলোকে (মানুষগুলোকে) আমরা বুঝতে পারি।

কিন্তু আমার সম্পর্কে আমি কখন চেতন হই, অথবা কখন আমার আত্ম-সচেতনতা হয়? সার্ত্র বলেন, অপর ব্যক্তি যখন আমার দিকে তাকায় এবং আমি যখন ঐ তাকানো (look) সম্পর্কে সচেতন থাকি, তখনই কেবলমাত্র আমার আত্মসচেতনতা আসে। চোর যখন চুরি করছে তখন তার চেতনা বস্তুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। সে যেন বস্তুতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এবার হঠাৎ পুলিশ তার মুখোমুখী হলো। তখন সহসা চোরটির চেতনা বস্তু থেকে সরে এসে তার অন্তরাভিমুখী হলো। পুলিশের ঠিক সম্মুখে চোরটি যেন তার নিজের ছবিটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সে তার আত্মাকে যেন পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করছে। আবার বলা যেতে পারে যে পুলিশের মুখ নামক দর্পণে চোরটি যেন নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে হেগেল-ও অত্ম-সচেতনতা বা আত্ম-চেতনা সম্পর্কে অনুরূপ কথা বলেছিলেন এবং একই কারণে আত্মাকে তিনি 'দর্পন-সদৃশ-আত্মা' (looking-glass self) বলেছিলেন। সম্ভবতঃ সার্ত্র হেগেল-এর কাছে থেকেই এরূপ আত্ম-চেতনার ধারনা পেয়েছিলেন। তবে সার্ত্র এরূপ ধারনার সূক্ষ্মতর এবং গভীরতর বিশ্লেষণ করেছেন। আত্মসচেতনতার এরূপ ব্যাখা দিতে গিয়ে সার্ত্র প্রত্যক্ষণরত টম্-এর (peeping Tom) দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সকলের অজ্ঞাতসারে টম্ চাবির ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভেতর কিছু দেখছিল। নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছিলো তার প্রত্যক্ষণের একাগ্রচিত্ততায়। এমন সময় কেউ এসে তাকে এমন অবস্থায় ধরে ফেললো। তখন সে তার লজ্জার মধ্য দিয়ে আত্মসচেতন হলো। সার্ত্র বলেন যে এখানে দুটো ঘটনা ঘটলো। প্রথমতঃ টম্ ও অপর ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক (interpersonal) সম্পর্ক হলো। দ্বিতীয়তঃ অপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে টম্ বুঝতে পারলো যে সে তার পরিস্থিতির প্রভু নয় (not master of the situation)। টম্ বুঝতে পারছে যে যে ব্যক্তি তাকে ধরে ফেলেছে, সে টম্‌কে বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় হিসেবে ভাবছে, এবং সে নিজেকে টম্-এর প্রভু মনে করছে। অপর ব্যক্তিটি যেন তার প্রত্যক্ষণের সাহায্যে টম্-এর স্বাধীনসত্তাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে, আর তাই অপর ব্যক্তির প্রতি টম্-এর এক প্রকার শত্রুতা (hostility) দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু অপর ব্যক্তি-ও ঠিক টম্-এর মতোই ভাবছে। সে-ও ভাবছে যে টম্ বোধহয় তাকে বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় হিসেবে ভাবছে এবং এভাবে তার স্বাধীনতাকে টম্ ধ্বংস করে দিতে চাইছে। কাজেই অপর ব্যক্তিটি-ও টম্-কে শত্রু হিসেবে ভাবছে। সার্ত্র ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমনি একপ্রকার শত্রুতার উপস্থিতি দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেন, সামাজিক শত্রুতা এবং দ্বন্দ্বের মূল উৎসই রয়েছে অপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষণে (look)।

এমন প্রত্যক্ষনে বা দর্শনে অপর ব্যক্তি আমাকে দেখে বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় হিসেবে বা বস্তু হিসেবে, এবং এমনিভাবে আমাকে অবলোকন করে অপর ব্যক্তি আমার সম্পর্কে বিচার প্রদান করে তার স্বীয় চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে। সে আমার বিচার করছে আমার প্রভুর মতো। কিন্তু আমি তো স্বাধীন, আমি তো বস্তু নই। তাই তার বিচার আমি মেনে নিতে চাই না এবং মেনে নিতে বাধ্য নই। আর এ-থেকেই তার প্রতি আমার শত্রুতা দেখা দেয়। আবার অপর ব্যক্তিও আমার সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে এবং তাই তারও আমার প্রতি শত্রুতা জন্মায়। অপর ব্যক্তি তার প্রত্যক্ষণের বা অবলোকনের (look) সময় যেমন আমার স্বাধীনতা অপহরণ করছে, আমিও তেমনি তাকে অবলোকন করার সময় তার স্বাধীনতা অপহরণ করছি। মানুষে মানুষে যত রকম সম্পর্কই থাক না কেন, সবরকম সম্পর্কেই রয়েছে এমনি স্বাধীনতা অপহরণের প্রচেষ্টা।

সার্ত্র বলেন, এমনকি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও চলে এমনি স্বাধীনতা অপহরনের প্রচেষ্টা। ভালোবাসায় আমরা অপর ব্যক্তিকে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে পূর্ণভাবে অধিকার করতে চাই, অর্থাৎ আমাদের ভালোবাসার পাত্রে প্রভু হতে চাই। কিন্তু ভালোবাসার পাত্রটি যদি এর ফলে বস্তু বা বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়েপরিণত হয়, তবে আমরা তাকে সত্যিকারে ভালোবাসতে পারি না। কেননা পূর্ণ ভালোবাসা হতে পারে কেবলমাত্র স্বাধীন দুটো মানুষের মধ্যে। কাজেই ভালোবাসার পাত্রের প্রভু হবার বাসনা থাকা সত্ত্বেও আমরা এ-ও চাই যে অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা অটুট থাক, কেননা বাধ্য হয়ে কেউ ভালোবাসলে সে ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা হতে পারে না। এ-থেকে সার্ত্র সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোবাসাও আমাদেরকে দেয় কেবল মাত্র হতাশা (hopelessness)।

সার্ত্র বলেন যে ভালোবাসার চেয়েও ভয়ঙ্কর হলো ভালোবাসার পাত্রের দেহ। অপর ব্যক্তির দেহ অপরাপর বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ের মতোই একটি বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়। সার্ত্র তার উপন্যাস *Nausea* (সার্ত্রের দেওয়া নামছিল *Melancholy*, প্রকাশকনাম দিয়েছেন Nausea)-তে দেখিয়েছে যে অপর ব্যক্তির চেতনা যেমন বিষন্নতা (anguish) সৃষ্টি করে, তেমনি অপর ব্যক্তির দেহ আমার মধ্যে (অন্যান্য বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ের মতো) বিরক্তি (অথবা বমনেচ্ছা অথবা শিরোপীড়া অথবা nausea) সৃষ্টি করে। অপর ব্যক্তির চেতনা বিষন্নতা সৃষ্টি করে, কারন অপর ব্যক্তির চেতনা আমার প্রভু হতে চায়। আবার অপর ব্যক্তির দেহ বিরক্তি (nausea) সৃষ্টি করে, কারণ আমার মনে হয় যে ঐ দেহ ভয়ঙ্করভাবে (horrifyingly) অযৌক্তিক (absurd) এবং অপ্রয়োজনীয় (superfluous)। শুধু অপর ব্যক্তির দেহ নয়, নিজের দেহ এবং অন্যান্য বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয়ও আমার মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন করে, কেননা এগুলো আমার কাছে ভয়ঙ্কর ভাবে অযৌক্তিক

এবং অপ্রয়োজনীয়। এসবের অস্তিত্বের স্বপক্ষে কোনরূপ যুক্তিই থাকতে পারে না—অথচ এসবের অস্তিত্ব আছে! যদি প্রশ্ন করা হয়, এগুলোর অস্তিত্ব কেন আছে? এগুলোর অর্থ কী? অথবা, এগুলোর উদ্দেশ্য বা আবশ্যিকতাই বা কী? — তাহলে যুক্তিসম্মত কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। অথচ এগুলো দৃঢ়ভাবে অস্তিত্বশীল রয়েছে। আমার মনে হয় যে এগুলোর অস্তিত্ব না থাকলেও চলতো, আর তাই আমার কাছে এগুলো অপ্রয়োজনীয়। অথচ এই অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক বিষয়গুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। এই হলো আমার বিরক্তির কারন।

আবার অযৌক্তিক হলেও এগুলোর অস্তিত্বের দৃঢ়তা দেখে আমার ভয় হয়। আর তাই এগুলো আমার কাছে ভয়ঙ্কর (horrifying)। সার্ত্র যেমন বিষয়ে-অধিষ্ঠিত বিষয়গুলোকে অযৌক্তিক বলেছেন, ইংরেজ কবি কোলরিজ-ও অনেকটা তেমনি বস্তুগুলোকে অযৌক্তিক (absurd) বলেছেন। তাঁর *The Friend*-এ কোলরিজ বলেছেন ঃ যদি কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করা যায় 'এটি আছে, কিন্তু কেন আছে?' — তাহলে মন এক বিরাট বিস্ময়ে ভরে উঠবে। যাহোক সার্ত্র প্রকৃতির বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একপ্রকার সান্দ্রতা (viscosity) দেখতে পেয়েছেন। বস্তুময় প্রকতির এই সান্দ্রতা হলো আঠালো (sticky)। জলৌকা (leech) যেমন তার নরম দেহের মধ্যে আমাদেরকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে চায়। প্রকৃতির এই সান্দ্রতা-ও তেমনি সমস্ত মানুষগুলোকে এবং জগৎ-প্রপঞ্চকে যেন গিলে ফেলতে চাইছে। সবকিছু যেন এই সান্দ্রতায় ক্রমশ মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। সার্ত্র বলেন যে এই সান্দ্রতা যেন নারীর মিষ্টি আঠালো প্রতিহিংসার মতো ("The viscous, he adds, symbolizes 'a sickly-sweet feminine revenge' of the slimy being-in-itself upon being-for-itself.")। বিষয়ে-অধিষ্ঠিত-বিষয় হলো নারী-সুলভ, আর বিষয়ের-জন্য-বিষয় হলো পুরুষ সুলভ। নারী-পুরুষের ভালোবাসায় নারী যেন তার সান্দ্রতায় পুরুষকে গিলে ফেলতে চায়। কাজেই ভালোবাসায় ও মানুষের মুক্তি নেই, অন্ততঃ নারী পুরুষের ভালোবাসায়। সার্ত্র বলেন যে এরূপ সান্দ্রতা সামাজিক-সম্পর্কেও রয়েছে। আর তাই সামাজিক-সম্পর্কেও চেতনা বা বিষয়ের-জন্য-বিষয় এমনিভাবে সান্দ্রতায় নিজেকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলে।

তবে মুক্তির ('deliverence') উপায়—মন্দ-বিশ্বাস থেকে মুক্তির উপায়? সার্ত্র মুক্তির কোন উপায় স্পষ্ট করে বলেননি। তিনি শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন। আশ্চর্যের কথা, যে সার্ত্র এতদিন তার অস্তিত্ববাদে ব্যক্তির মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা বলেছেন, সেই সার্ত্রই জীবনের শেষের দিকে বলে ফেললেন যে মুক্তির উপায় হলো সাম্যবাদ (Communism)। ল্যাভাইন (T.Z.Lavine) সার্ত্র-এর এই আমূল এবং আকস্মিক পরিবর্তনকে একটি বিস্ফোরনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম্-এও তিনি মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন না। আর তাই অনতি বিলম্বেই তিনি কম্যুনিজম পরিত্যাগ করলেন। তবে সার্ত্র মুক্তির পথের দিশা দিতে না পারলেও হতাশা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথের সংকেত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ যদি আকাঙ্খা-বর্জিত হয়ে কাজ করতে পারে, তবেই সে হতাশা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। ("Sartre also seems to speak for the view, in so far as he maintains that a man should act without anticipation or expectation of results, so as to keep himself away from despair ") আশ্চর্যের কথা, এখানে হয়তো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের অনুশাসনের সঙ্গে ("Karma-yoga") সার্ত্রের আকাঙ্খা-বর্জিত সাম্যবাদী (Communist) ক্রিয়ার পথ-নির্দেশের খানিকটা মিল রয়েছে। যাহোক, সার্ত্র একাধারে ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক ছিলেন। কাজেই তাঁর উপন্যাসগুলোতে যেমন মুক্তির অবকাশ থাকতে পারে, তেমনি তাঁর দর্শনে কল্পনার স্থানও থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবু বলা যায় যে সার্ত্র নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক না ভেবে একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ভাবতেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ পাঠকের মতেই তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন দার্শনিক, এবং এমনকি রবার্ট ডেনুন কুমিং-এর (Robert Denoon Cumming) মতে সার্ত্র ছিলেন এ-যুগের একমাত্র দার্শনিক "Sartre is the only philosopher of our time "।